ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২১ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৫ তম বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা ■ হৃষীকেশ ৫৩৫ ■ সেপ্টেম্বর ২০২১

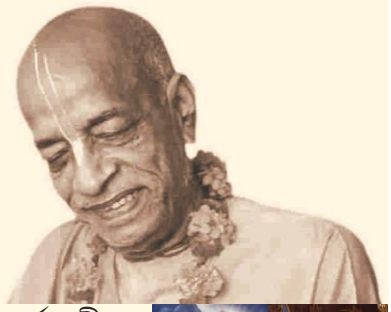

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

মূর্খদের জন্য কর্ম

অনেক মূর্খ মনে করতে পারে যে সে কেন মনুষ্য দেহ পেয়েছে এবং সে আর কখনো নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে পশুদেহ পাবে না। এটি খুব উপাদেয়। (হাসতে হাসতে)। কিন্তু প্রকৃতি বাধ্য করবে তাকে একটি বেড়াল অথবা কুকুরের দেহ গ্রহণ করতে।

৬ আচার্য বাণী

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগই গৃহস্থ জীবন

যদি শ্রীকৃষ্ণের শুধু এটিই বলার ছিল যে তোমার কর্ম কর; কর্মই পূজা, তাহলে আপাতত সেক্ষেত্রে ভগবদ্গীতায় একটি শ্লোকই থাকত। এই সকল শ্লোকগুলি আমাদের নির্দেশ প্রদান করে, যে কোন চেতনায় থেকে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে।

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা কেন শ্রীমতী রাধারাণীর পূজা করি

তিনি শৃগালটিকে গর্ত থেকে উদ্ধার করলেন এবং শৃগালটি তখন প্রাণভয়ে কাঁপ ছিল। শৃগালটিকে রাধারাণীর কাছে নিয়ে আসা হলো, শৃগালটি রাধারাণীর পদতলে পতিত হলো এবং তিনি শৃগালটিকে কৃপা করলেন।

১৩ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—ভগবানের সেবা যতই নগণ্য হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা বিফলে যায় না। জড় জাগতিক স্তরে যে কোন কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন তাৎপর্যই থাকে না।

১৭ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

ভগবান বললেন, অল্পকালের জন্যও যদি সাধু-সেবা করা হয়, তাহলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা কখনই বিফল হয় না।

২২ বিশেষ প্রবন্ধ

করোনা রাজ্যে আমরা

এখনও সাধারণ লোকে বলে, করোনা হলেও করার কিছু নেই। টাকা যা জমে রেখেছ, বেঁচে থাকলে ভোগ করবে, না বাঁচলে এক পয়সাও যমপুরীতে নিতে পারবে না, সেখানে তোমার টাকা কোনও কাজে লাগবে না।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

সেনাপতি ভক্ত

এইভাবে কিছুক্ষণ শ্রবণ করেই অভয় বুঝতে পারলেন যে উনার যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ অকাট্য, তখন তিনি অন্তর থেকে তা মেনে নিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ মল্লিক যখন প্রশ্ন করলেন, কি মনে হল, অভয় বললেন, মহাপ্রভুর বাণী এখন এক যোগ্য মহাপুরুষের হাতে রয়েছে।

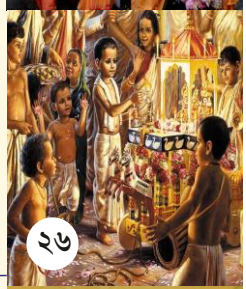

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

কোন্ মনোভাব নিয়ে জপ করা উচিত?

১২ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

কাঁচা আম ও কমল কাঁকরীর আচার

২০ ইসকন সমাচার

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে শ্রীল প্রভুপাদের মুদ্রা প্রকাশ

২৯ ছোটদের আসর

নারদমুনি এবং সাপ

৩১ ভক্তি কবিতা

শ্রীরাধিকা বন্দনা

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

রাধারাণী কে?

ঠিক যেমন সূর্য এবং সূর্য কিরণ একে অপরের থেকে অভিন্ন। অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধারাণী একে অপরের থেকে অভিন্ন। ঠিক সূর্য যেমন সূর্য কিরণের উৎস অনুরূপভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর এই সমস্ত নিখিল বিশ্বের সকল সৃষ্টির একমাত্র উৎস। তিনি এমন কি রাধারাণীর উৎস স্বরূপ। কৃষ্ণ নিজে পূর্ণ এবং যখন তিনি প্রেমরস আস্বাদন করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি রাধারাণী রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। সুতরাং রাধারাণী হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম শক্তিমান এবং রাধারাণী হচ্ছেন কৃষ্ণের পরম শক্তি। কৃষ্ণ হলেন পরম সত্যের পুরুষ প্রকাশ এবং শ্রীমতি রাধারাণী হলেন পরম সত্যের প্রকৃতি প্রকাশ।

শ্রীমতি রাধারাণী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন। কিন্তু তাঁরা একে অপরের চিন্ময় প্রেমরস আস্বাদন করার জন্য নিজেদেরকে শাশ্বত ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। ''তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের সহায়িকা।'' (চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৪।৭১) ঠিক সূর্য কিরণ ব্যতীত সূর্য যেমন অসম্পূর্ণ অনুরূপ ভাবে শ্রীমতি রাধারাণী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ অসম্পূর্ণ।

''রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি / অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।'' শ্রীমতি রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন কিন্তু তাঁরা দুটি পৃথক দেহ ধারণ করেছেন। এভাবেই তাঁরা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন। (চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৪।৫)

শ্রীমতি রাধারানী শ্রীকৃষ্ণকে চরম সুখ প্রদান করতে এবং তাঁর লীলাসমূহ আরও অধিক বর্ণময় করতে তিনি নিজেকে কৃষ্ণের বহু কান্তা রূপে বিস্তার করেছেন। (চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৪।৮০)। বহু কান্তা ব্যতীত রস আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। তাই ভগবানের লীলাবিলাসে সহায়তা করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণী বহুরূপে প্রকাশিত হন।''

বৈকুণ্ঠের লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীদেবীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজগোপিকারা যাঁরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবাতে নিযুক্ত তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রীমতী রাধারাণীর প্রকাশ ''শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সহচরীরা তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজগোপিকাগণ। ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণী থেকে এই সমস্ত কন্যাদের বিস্তার হয়েছে।'' (চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ৪।৭৪-৭৫)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে মধুর রস আস্বাদন করেন তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির সঙ্গেই আনন্দ উপভোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে লীলাবিলাসটি শিশু তার ছায়ার সঙ্গে ক্রীড়া করার অনুরূপ। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, কারণ তারা রাধা এবং কৃষ্ণকে সাধারণ বালক-বালিকা বলে মনে করে। কিন্তু আমরা যদি শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করি এবং মহান আচার্যদের শিক্ষাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করবো যে রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্কটি চিন্ময় এবং পূর্ণরূপে নির্মল।

''পরদেবতা শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণময়ী', 'সর্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্বকান্তি', সম্মোহিনী ও পরাশক্তি বলে কথিত হয়েছেন।'' (চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ৪।৮৩)

নিম্নলিখিত কথোপকথনটি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁর কতিপয় শিষ্যের মধ্যে ১৯৭৪ সালের মে মাসে রোমে সংগঠিত হয়েছিল।

মূর্খদের জন্য কর্ম

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

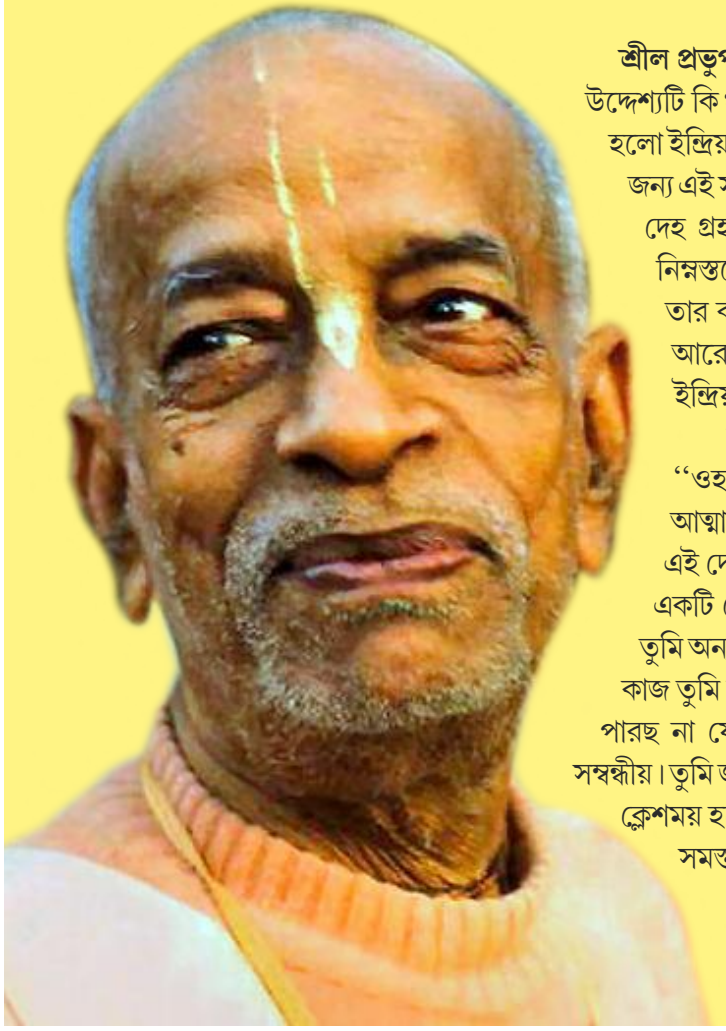

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মানুষেরা সকল প্রকার নিষিদ্ধ কার্য করে চলেছে। কেন? উদ্দেশ্যটি কি? *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম যৎ ইন্দ্রিয়-প্রীতয়* একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ইন্দ্রিয় তর্পণ, মূর্খেরা একেবারেই চিন্তা করে না। "আমি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এই সকল পাপ কর্ম করছি এবং ফল স্বরূপ আমাকে একটি নিম্নস্তরের দেহ গ্রহণ করতে হবে।" এটি সে জানে না। ইতিমধ্যেই সে একটি নিম্নস্তরের দেহ লাভ করেছে এবং তাই সে দুর্দশা ভোগ করছে। এবং তার বর্তমান কার্যকলাপের দ্বারা সে এটি নিশ্চিত করছে যে সে অন্য আরেকটি নিম্নস্তরের দেহ লাভ করবে আরও অধিক দুর্দশা। তবুও সে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সবকিছু করে চলবে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ তাকে সাবধান করে, *ন সাধু মন্যে যতো আত্মন* "ওহ এটি ভালো নয়, এই ধরনের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই তোমার আত্মাকে একটি দুর্দশাগ্রস্ত দেহ দ্বারা আবদ্ধ করে ফেলেছে।" "ভালো, এই দেহটি অস্থায়ী। আমি উদ্বিগ্ন হতে যাচ্ছি না।" "অতপর অন্য আর একটি দেহ ধারণ কর। মূর্খ, এই দেহটি অস্থায়ী কিন্তু এই জীবনের পর তুমি অন্য একটি দেহ পাবে। অতি জঘন্য। সুতরাং কেন এই সমস্ত নোংরা কাজ তুমি করছ। এটি সত্য যে এই দেহটি অস্থায়ী, কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারছ না যে এটিও ক্লেশ। এটি সর্বদাই জড়জগতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার সম্বন্ধীয়। তুমি জান এই দেহটি ক্লেশকর এবং অন্য যে কোনও দেহ পাবে সেটিও ক্লেশময় হবে। তাই কেন তুমি এই বার বার দেহ প্রাপ্তি বজায় রাখবে? এই সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ কর।"

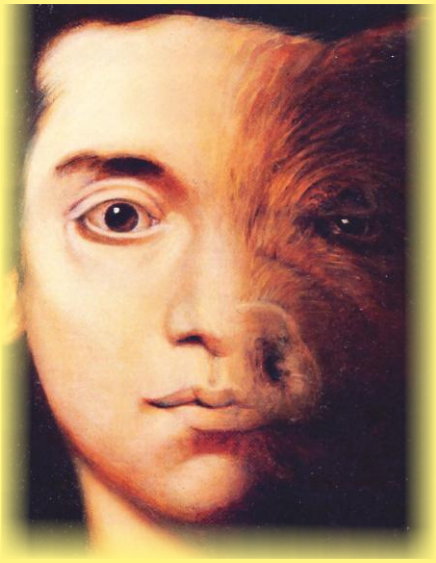

এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত। কিন্তু মানুষ জানে না যে যেকোন দেহই তুমি পাও না কেন সেটিই ক্লেশ যুক্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ তারা একটি আরাম দায়ক অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। কিন্তু যদি মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য সেখানে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা থাকে তাহলে বহু মানুষ মৃত্যু বরণ করতে পারে এমনকি সেই অট্টালিকাতেও। এটি সত্য নয় কি? সুতরাং তুমি ঐরকম বা অন্য রকম যে কোন জড় অবস্থাতেই থাক না কেন দুঃখ, দুর্দশা সেখানে থাকবেই। এবং এই লম্বা অট্টালিকায় শুধু আরাম প্রাপ্ত করার জন্য কত দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

মালিক বলতে পারে, ''মহাশয়, আমি কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি না। শ্রমিকরা তা করছে।''

''কিন্তু তোমাকে অর্থ যোগাড় করতে হবে তাদের দেবার জন্য। অর্থ সংগ্রহটি যা শ্রমিকদেরকে দিতে হবে সেটি কত দুর্দশাপূর্ণ।''

মানুষ শুধুমাত্র অর্থ দ্বারা মোহিত হয়ে আছে। অন্যথায় পূর্ণ ব্যবস্থাটি দুঃখজনক। কখনো কখনো গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের সময় শ্রমিকদের সেখান থেকে পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। করে না? এবং আমি শুনেছি যে, নিউইয়র্কে বহু বাড়িতে কোন বসবাসকারী নেই। অন্য দুর্দশা, অট্টালিকার মালিক সে দুর্দশা ভোগ করছে। আমি এত বিপুল অর্থ লন্ডনে ব্যয় করলাম, কিন্তু কোন ভাড়াটিয়া নেই। বিগত ছয় থেকে সাতবছর লন্ডনে বৃহৎ অট্টালিকাগুলি ফাঁকা পড়ে আছে।

শিষ্য ঃ টোটেনহাম কোর্ট রোডে। হ্যাঁ এরকম বড় বাড়ী আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ (হাসতে হাসতে) মালিকের আরও দুর্দশা হলো যে যদি তিনি ভাড়াটিয়া রাখেন, তাহলেও ভাড়াটিয়াবিহীন অবস্থা থেকে সেইটি আরও দুর্দশাজনক। এটা সত্যি নয় কি? তাই সে বিনা ভাড়াটিয়াতেই থাকতে চায় — কারণ তাহলে তাকে অনেক কর জমা দিতে হবে সেটি তার পক্ষে আরও দুর্দশা জনক। তাই সে এটি পরিপূর্ণ করতে চায়। এর সারমর্ম হলো এই যে অট্টালিকা নির্মাণটি ছিল সমস্যাপূর্ণ এখন এটি রাখাও সমস্যাপূর্ণ। আনন্দপ্রাপ্তির খোঁজে মানুষ এটা-সেটা বহু কিছু তৈরী করছে। তথাপি তারা সেটি ভোগ করতে পারে না। ক্ষণকালের জন্য তারা এটি ভোগ করতে পারে তার পর সেটি পুনরায় অর্থহীন হয়ে যায়।

শিষ্য ঃ কখনো কখনো মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়। আমি কি ভাবে নিশ্চিত হব যে আমি সাধ্য সত্যি একটি পাখী অথবা কুকুর হতে পারি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই সমস্ত পাখী এবং কুকুর কোথা থেকে আসছে? এই সমস্ত মানুষেরা এর উত্তর দিক। কোথা থেকে এই পাখী এবং কুকুরেরা আসছে?

শিষ্য ঃ হ্যাঁ, অধিকাংশ মানুষই বলবে অন্য সমস্ত পাখী এবং কুকুর থেকে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি সেটি মনে করতে পার, কিন্তু তুমি প্রকৃতির নিয়ম জান না। প্রকৃতি এই সমস্ত দেহ সরবরাহ করছে এবং তোমার পূর্বকৃত কর্ম তোমাকে সেই দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই ঘরটির কথাই ভাব— হয় তুমি গ্রহণ কর নচেৎ অন্য কেউ গ্রহণ করবে। অনুরূপ ভাবে এই দেহটি হলো একটি ঘর, প্রকৃতি এটি সরবরাহ করে এবং তোমাকে এটি গ্রহণ করতে হবে। আমরা সকলেই চিন্ময় সত্তা এবং প্রকৃতির নির্দেশানুসারে আমরা জড় দেহ পরিবর্তন করছি। আমার পূর্বকৃত কর্ম আমাকে এক প্রকার দেহ পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে। তার পূর্বকৃত কর্ম তাকে অন্য প্রকার দেহ পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে। তার পূর্বকৃত কর্ম তাকে অন্য প্রকারের দেহ পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে। সেটি কি অযৌক্তিক? আমাদের পরবর্তী জীবন গুলিতে এই ব্যক্তি আমার মতো দেহ গ্রহণ করতে পারে, এবং আমি তার মতো দেহ গ্রহণ করতে পারি। এই শুধু মাত্র একটি গৃহ-পরিবর্তনের ন্যায়। আমি একরকম গৃহে যেতে পারি, সে অন্য এক প্রকারের

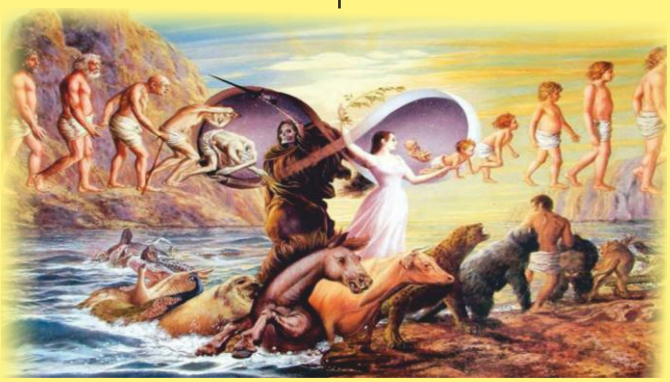

গৃহে যেতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক, প্রকৃতিই সমস্ত গৃহ সরবরাহ করছে।

তুমি বলতে পার না, ''না, না আমি এই দেহ গ্রহণ করছি না।''

প্রকৃতি জবাব দেবে, ''না না, কোন ভাবেই তোমার সিদ্ধান্ত নয়। কত 'অর্থ' (সু কর্ম) তুমি সংগ্রহ করেছ মহাশয় তোমার বাসস্থান ক্রয় করার জন্য?

''আমার কোন অর্থ নেই''।

''ঠিক আছে। তাহলে ঐ ঘরে যাও।'' এবং তোমাকে অবশ্য করে সেই গৃহ গ্রহণ করতে হবে। *কর্মণা দৈব - নেত্রেণ।* তোমার পূর্বকৃত কর্ম দ্বারা তোমার গৃহ কেমন হবে সেটি নির্ধারিত হবে। এটি তোমার সিদ্ধান্ত নয়।

অনেক মূর্খ মনে করতে পারে যে সে কেন মনুষ্য দেহ পেয়েছে এবং সে আর কখনো নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে পশুদেহ পাবে না। এটি খুব উপাদেয়। (হাসতে হাসতে)। কিন্তু প্রকৃতি বাধ্য করবে তাকে একটি বেড়াল অথবা কুকুরের দেহ গ্রহণ করতে। সিদ্ধান্তটি তোমার নয়, তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের — ঠিক যেমন অফিসে যখন তোমার পদোন্নতি বা পদাবনত হয় সেখানে সিদ্ধান্তটি তোমার নয়, সিদ্ধান্তটি নির্দেশকের। তুমি বলতে পার না, ''না, না আমি নুতন পদটি গ্রহণ করতে পারছি না।'' না তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

কর্মগুণসঙ্গস্য সদ্ অসদ্ যোনি জন্মসুঃ এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের দেহ প্রাপ্ত হওয়ার কারণটি হলো তোমার বিভিন্ন প্রকার জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ করা। অন্যথায় সেখানে কেন এত ভিন্নতা? একজন কাক হলো, অন্য আরেকজন হলো চড়াই পাখি, আরেকজন হলো কুকুর, অন্য আর একজন হলো বেড়াল, অন্য আর একজন হলো গাছ, অন্য আর একজন হলো ঘাস। প্রকৃতি এত দক্ষ যে যদিও দুর্দশা বিভিন্ন প্রকারের তথাপি তিনি সেগুলিকে এমনভাবে সম্মিলিত করেন যা দেখতে সুন্দর লাগে।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগই গৃহস্থ জীবন

শ্রীমদ্ রাধানাথ স্বামী মহারাজ

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।
(গীতা ৩।২৮)

প্রকৃতপক্ষে পরম সত্য কি তা ভগবদ্গীতায় এই শ্লোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, এটি ব্যবহারিক। আমরা পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে গীতা পঠন-পাঠন করলেও এতে কি বলা হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম নাও করতে পারি।

দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণের কাহিনী—

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকে একজন সরল ব্রাহ্মণের কাহিনী উল্লেখ করতেন যিনি বাস্তবে নিরক্ষর ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের যে প্রদেশে শ্রীরঙ্গম মন্দির অবস্থিত তিনি সেখানে বাস করতেন। তার গুরুমহারাজ তাকে প্রত্যহ সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতা পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইহেতু তিনি মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসে প্রত্যহ ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম করে ভগবদ্গীতা পাঠ করতেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানী, পণ্ডিত প্রতিদিন মন্দির দর্শনে আসতেন এবং যখন তারা দেখতেন অত্যন্ত সরল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোনওভাবে গীতা পাঠ করার প্রচেষ্টা করছেন, সঠিকভাবে অক্ষরগুলি উচ্চারণও করতে পারছেন না, তাঁরা কোনও সময় তার দিকে তাকিয়ে হাসতেন, কখনও সমালোচনা করতেন। এভাবে তাকে বিশেষ সম্মান করতেন না।

গীতার বক্তা, শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণকালে এই ব্রাহ্মণকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করলেন "আপনি গীতার কোন্ অংশটি পড়ছেন?" ব্রাহ্মণ বললেন "প্রকৃতপক্ষে আমি জানিই না। কখনও আমি সঠিকভাবে বলি, কখনও ভুল বলি, পার্থক্য বুঝতে পারি না। আমি পণ্ডিত নই।" মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আপনার চোখে জল কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "কারণ যখন আমি হৃদয়ে এই চিত্রটি ধ্যান করি—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকল প্রভুর প্রভু, সকল অস্তিত্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের কারণ, জীবনের পরম লক্ষ্য, তিনি স্বয়ং তাঁর নিজ ভক্তের দাসরূপে তার রথচালনা করছেন। তাঁর ভক্তকে তিনি কতো ভালোবাসেন, কিভাবে তিনি তাঁর ভক্তের সেবা করেন, এটি আমার চোখে জল এনে দেয়।" যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একথা শুনলেন, অত্যন্ত আনন্দে তিনি ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করে বলেন "আপনিই গীতার সারমর্ম প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।" মহাপ্রভু সেই ভক্তের হৃদয়ে সকল শাস্ত্রের পরম উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রেমজ পুলকের প্রকৃত উপলব্ধি জাগরিত করালেন। সুতরাং তিনি পণ্ডিত নাও হতে পারেন কিন্তু সকল শিক্ষার সারাতিসারটিকে তিনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন এবং সেইহেতু তিনি মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হলেন। পরবর্তী

চতুর্মাসের প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁর সঙ্গদান করে তাকে আশীর্বাদধন্য করেছিলেন কারণ তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

আমাদের জীবনে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োগ করা উচিত—

তাত্ত্বিক জ্ঞান অপরিহার্য যাতে আমরা জানতে পারি কি করতে হবে আর কি করা যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই জ্ঞান আমাদের জীবনে প্রয়োগ হবে ততক্ষণ কোন উপলব্ধি হবে না। শ্রীকৃষ্ণের আমাদের স্মরণ ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। তাঁর আমাদের পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি অভীজ্ঞ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব জানেন। তিনি সকল জীবাত্মাকে জানেন, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। কিন্তু যখন একজন ভক্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চান, ভগবান আগ্রহে সেই ভক্তের প্রেমের কাছে হার স্বীকার করেন। ভগবানের ভক্ত যখন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য উন্মুখ থাকেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁর ভক্তের সেবা করার জন্য ব্যগ্র থাকেন। শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে সেই মহান সম্পদ লাভ করা যায়।

জ্ঞানের অর্থ হল এটি উপলব্ধি করা যে আমি এই দেহ নই, আমি দেহাভ্যন্তরে অবস্থানরত শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় নিত্য আত্মার অংশ। সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের সেবাই আমার ধর্ম হওয়া উচিত। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মনে করে ধর্ম হল এমন কিছু যা জীবনের জাগতিক প্রয়াসের পাশাপাশি অবস্থান করে। যেমন অর্থ উপার্জনের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করি, আমি আমার পরিবার প্রতিপালন করি এই পৃথিবীতে লভ্য সমস্ত বিলাস আমরা উপভোগ করি এবং সপ্তাহে একবার আমি পূজা করতে যাই অথবা আমি কিছু দান করি। কিন্তু ধর্ম, সনাতন ধর্মের প্রকৃত উপলব্ধি হল যে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হয়ে থাকি, যদি সেটিই আমার প্রকৃতি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সমস্ত কর্ম, সকল ভাবনা, আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত। এটি আমাদের জীবনের বাকী অংশ থেকে পৃথক হতে পারে না, এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়া উচিত।

অর্জুন—গৃহস্থ আশ্রমে ভগবানের এক দৃষ্টান্তমূলক ভক্ত—

ভগবদ্গীতায় আমরা অর্জুনকে দেখি যিনি একজন গৃহস্থ, সন্তানসহ এক বিবাহিত পুরুষ এবং পেশাগত কর্তব্যে অত্যন্ত দায়িত্বশীল। তিনি একজন যোদ্ধা, দেশনায়ক। যিনি পূর্ণ শক্তিতে তার কার্য সমাধান করেন। এখন ভগবদ্গীতায় তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কুরু এবং পাণ্ডবদের যুযুধান শক্তিকে দেখলেন। উভয় পক্ষেই তিনি তার বন্ধু, আত্মীয় এবং প্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের দেখলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি যুদ্ধ করব না। আমি এক বৈরাগী হব। আমি এই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে সম্ভবত বনেও চলে যাব কিন্তু যুদ্ধ করব না। সেইহেতু মানবতার ইতিহাসের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় সাতশ শ্লোকের প্রবচন শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করলেন। অর্জুনকে শুধুমাত্র উপলব্ধি করানোর জন্য যে তার অবশ্যই তাকে প্রদত্ত কর্তব্য পালন করা উচিত। গীতার প্রকৃত বাণী হলো প্রত্যেকের চেতনা অনুসারে নিজ কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

কিছু মানুষ ভাবেন যে গীতার শিক্ষা হলো কর্ম করা। কর্মই পূজা। শুধু তোমার কর্তব্য পালন কর। কোন জীবাত্মার ক্ষতিসাধন করো না এবং সেটিই ধর্ম, কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ তা বলেননি। তিনি অর্জুনকে অন্য জীবাত্মার ক্ষতিসাধন না করতে বলেননি। তিনি তাকে যুদ্ধ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিধন করতে বলেছেন? এবং শুধু কর্ম কর, কর্মই পূজা। যদি শ্রীকৃষ্ণের শুধু এটিই বলার ছিল যে তোমার কর্ম কর; কর্মই পূজা, তাহলে আপাতত সেক্ষেত্রে ভগবদ্গীতায় একটি শ্লোকই থাকত। এই সকল শ্লোকগুলি আমাদের নির্দেশ প্রদান করে, যে কোন চেতনায় থেকে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুলি অহিংসার সর্বোত্তম নীতি। তিনি আমাদের সর্বোচ্চ নীতিশিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োগের শিক্ষা প্রদান করছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত এক যোদ্ধা এবং এক যোগী যদি যথার্থ ভগবৎ চেতনায় অবস্থান করে থাকেন, সেক্ষেত্রে একজন ডাক্তার, গৃহবধূ, প্রযুক্তিবিদ্ অথবা একজন ব্যবসায়ীর অথবা একজন শিক্ষকের ভগবৎচেতনায় সফল হবার কোন বাধাই নেই। আমাদের বর্ণ, আশ্রম, আমাদের বিশেষ পেশাটি যাই হোক না কেন আমাদের নিজেদের পরিচয় আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। আমরা এই দেহ নই, আমাদের নিজস্ব এবং অন্যদের দৈহিক সন্তুষ্টি সাধন করাই শুধু আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের হৃদয় শোধন করে, কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করা এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই আমাদের লক্ষ্য।

যদি শ্রীকৃষ্ণের শুধু এটিই বলার ছিল যে তোমার কর্ম কর; কর্মই পূজা, তাহলে আপাতত সেক্ষেত্রে ভগবদ্গীতায় একটি শ্লোকই থাকত। এই সকল শ্লোকগুলি আমাদের নির্দেশ প্রদান করে, যে কোন চেতনায় থেকে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুলি অহিংসার সর্বোত্তম নীতি। তিনি আমাদের সর্বোচ্চ নীতিশিক্ষা প্রদান করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দেন যে আমরা যেন সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখতে শিখি। আমাদের জীবন ক্ষুদ্র এবং অনিত্য। আমাদের যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে এবং অর্থ রোজগারের পরিমাণের উপর জীবনের সাফল্য নির্ভর করে না। জীবনের যথার্থ সাফল্য আপনার শিক্ষার উপরও নির্ভর

করে না। নির্বাচনে কত ভোট পেয়েছেন তার উপরেও নির্ভর করে না। কারণ সময়ের ঢেউয়ে এই সবই নিমেষে ধুয়ে যাবে। মৃত্যুকালে কিছুই থাকবে না। আপনার কাছ থেকে সবকিছুই নিয়ে নেওয়া হবে। আপনার সুন্দর বাড়ী, খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা থাকতে পারে। সুন্দর প্রেমপূর্ণ পরিবার থাকতে পারে। কিন্তু এই সকলই মৃত্যুর সময় বিনষ্ট হয়ে যাবে। অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ জীবনের উদ্দেশ্য। কারণ যদি আপনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তবে আপনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরে যাবেন। সেই চিন্ময় লোকে যেখানে জীবন নিত্য জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ। এবং শুধু তাই নয়, যদি আপনি অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, ভগবানের কৃপায় অতীত এবং ভবিষ্যতে আপনার আত্মীয়গণ কয়েক প্রজন্ম ধরে মোক্ষপ্রাপ্ত হবেন। এই হলো দয়া, এই হলো সেবা।

আমরাও অর্জুনের মতো এই পৃথিবীতে আছি এবং আমাদের অনেক আপেক্ষিক দায়িত্বও আছে। কিন্তু সকল দায়িত্ব কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হওয়া উচিত। আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতে সব কিছুই কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় দেখি। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সবকিছুর স্রষ্টা, অধীশ্বর। ভগবদ্গীতা (৫।৯) যে শান্তি সূত্রটি শিক্ষা দেয় তা সরলভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সকলের অধীশ্বর এবং সবকিছুই তাঁর ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। তিনি সকল জীবাত্মার সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। সেইজন্য যদি আমরা অর্থের জন্য কর্ম করি, তাহলে নিশ্চিত করতে হবে যে, যখন আমরা অর্থের জন্য কর্ম করব তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেই ভাবব। আমরা জানি যে এই অর্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবহৃত হবে। একটি কৃষ্ণভাবনামৃত পরিবার গঠন করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদিত ভোগের জন্য। একটি এমন গৃহ তৈরীর জন্য যা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির হবে, কৃষ্ণভক্তদের সেবার জন্য। যারা আকাঙ্ক্ষী তাদের উপকারের জন্য, তাদের শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিভিন্ন রূপে প্রদান করার জন্য। সেটি প্রসাদ হতে পারে। প্রবচন হতে পারে। তাদের প্রতি দয়াশীল হওয়া। যদি কোন ব্যক্তির বস্ত্র না থাকে এবং আপনার বস্ত্র থেকে থাকে, এটি গৃহস্থের কর্তব্য তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমন উপায়ে কর্ম করতে হবে যাতে তারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন। এইরূপে ভগবদ্গীতার জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে। এবং এটিই হলো এই আশ্চর্য শ্লোকের সারমর্ম। আমাদের ভক্তিমূলক সেবা এবং সকাম কর্মের মধ্যে পার্থক্য জানা উচিত।

এই কলিযুগে এমনকি স্বীকৃত ধার্মিক মানুষের পক্ষেই সকাম কর্ম এবং ভক্তিমূলক সেবার পার্থক্যের উপলব্ধি বিরল। বাস্তবিকভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মীয় জগতে সবাই মনে করে ধর্ম হলো ভগবানের উদ্দেশ্যে কামনা পূরণের জন্য কর্ম সম্পাদন। এটিই হলো শ্রীল প্রভুপাদের অনন্য অবদান যিনি আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবার শিক্ষা প্রদান করেছেন। প্রভুপাদ আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের চেতনায় অবস্থান করে কর্ম করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা যেহেতু সকাম কর্ম এবং ভক্তিমূলক সেবার মধ্যে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম তাই আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু ও সাধুদের শরণাগত হওয়া উচিত যারা আমাদের সহায়তা করতে এসেছেন। আমাদের শাস্ত্রের শরণ নেওয়া উচিত। অন্যথায়, আমাদের চারিপাশের সমাজ পুনরায় আমাদের সেই জড়জাগতিক, ইতর ভাবনার দিকে নিম্নগামী করবে। যে ব্যক্তি সকাম কর্মকে প্রকৃত ধর্ম রূপে শিক্ষা দান করেন তিনি ছলনা করছেন। প্রভুপাদ আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবার শিক্ষাদান করেছেন। আমরা যা করি তা আমাদের ভগবানের নিত্যদাসরূপী স্থিতি অনুসারে করতে হবে। আমাদের প্রকৃত চেতনার স্তর যাই হোক না কেন আমাদের সর্বদা সেই উৎকর্ষতার প্রাপ্তির জন্য প্রয়াসী হতে হবে।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন১। কোন্ মনোভাব নিয়ে জপ করা উচিত? হরিনামের প্রতি কিভাবে আসক্তি বৃদ্ধি হবে?

—তৃপ্তিময়ী জাহ্নবী দেবী দাসী, গৌরনগর

উত্তর ঃ ১) শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় সময় বলতেন যে, জপের অর্থ হচ্ছে সেবা প্রার্থনা ঃ ''হে প্রভু! হে কৃষ্ণ! হে ভগবৎশক্তি রাধে! দয়া করে আমাকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করুন!'' ''অপরাধশূন্য হয়ে সেবার মনোভাব নিয়ে তুমি যদি জপ করো, কৃষ্ণ তোমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন।'' (প্রভুপাদ প্রবচন ২২/১০/১৯৭২)

২) ইসকনের অন্যতম সন্ন্যাসী শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী মহারাজ বলেন, 'এখনই আমার মৃত্যু হবে। আমার আর করার কিছুই নেই। হে কৃষ্ণ! শুধু তোমাকে স্মরণ করছি।' উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যেই অন্তর থেকে হরিনাম হয়।

৩) সব রকমের অহমিকা শূন্য হৃদয়, সর্ব উৎপীড়ন সয়ে থাকা, সর্বজীবে যথাযথ সম্মান দান, নিজে অমানী হয়ে থাকা—এই গুণগুলি অভ্যাস করে সর্বদা হরিনাম করা কর্তব্য বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন।

৪) হরিনাম হচ্ছে এক কান্না। মা-বাবাকে খুঁজে না পেলে ব্যাকুল হয়ে বাচ্চা যেমন কান্না করে, প্রিয়জনের আগমনের আকাঙ্ক্ষায় প্রিয়া যেমন বিরহ বেদনায় কাঁদে। হরিনাম সেই রকম শ্রীশ্রীরাধামাধবের সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় কান্না।

৫) নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন এক রূপ।

তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ।।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—অভিন্ন, চিন্ময় ও আনন্দময়। যতবার তাঁর নাম করছি, ততবারই তিনি শুনছেন। যতবার তাঁর নাম করছি, ততবার তিনি দেখছেন। তিনি শুনছেন ও দেখছেন—তখন আমার সংযত প্রীতিপূর্ণ মনোযোগ হওয়া দরকার। কাউকে যদি বারবার ডাকাডাকি করি তবে সে বিরক্ত হবে। কিন্তু কৃষ্ণনাম যদি অনবরত করি তাতে শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হবার পরিবর্তে প্রীতিপূর্ণভাবে আশীর্বাদ করবেন। কেননা তাঁর নাম জপ করতে কীর্তন করতে তিনিই নির্দেশ দিচ্ছেন।

যাদের এই বাস্তব মনোভাব আছে তারা হরিনাম ছাড়া থাকতে পারে না। যারা মায়ামোহতে সুখী তারা হরিনাম এড়িয়ে থাকে। জীবনে দুইটি বিষয় আছে—হয় 'কৃষ্ণ' নতুবা 'মায়া'। যাকে নিয়ে তৃপ্ত হতে চান তারই কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ করবেন। তারই নাম জপবেন। তাকেই ভাববেন। তাতেই আসক্তি বাড়বে।

প্রশ্ন২। আমার একমাত্র ছেলে ও বৌমাকে আমি খুব আদর করি। কিন্তু এখন আমার বুড়ো বয়সে তাদের কোনও কথা সহ্য করতে পারি না। তারাও আমাকে পছন্দ করছে না। কি করবো? **—বিমল চন্দ্র কর,** পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর ঃ রামায়ণে বলা হয়েছে, আদর বা প্রণয় করো, কিন্তু খুব বা অতি প্রণয় কিংবা অপ্রণয় বা অনাদর করো না। কারণ দুটোই অতিশয় দোষের। তাই মাঝামাঝি থাকতে হয়।

ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্যঃ কর্তব্যোহপ্রণয়শ্চ তে।
উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব।। (রাঃ ৪/২২/২৩)

যেমনটি বাংলায় প্রবাদ আছে—অতি আদরে বাঁদর হয়। এই জগতে আমি যদি বেশী আদর করি তাহলে আমিও আদর-যত্ন বেশী পেতে পারবো এই আশা করাটা ভালো চরিত্রের লক্ষণ নয়। আপনি কাউকে আদর যত্ন করছেন—সেটি আপনার ভালো গুণ। কিন্তু আপনাকে লোকে আদর-যত্ন করবে, কি করবে না, সেটি চিন্তা না করাই ভালো। সেটি আপনার ভাগ্যের ব্যাপার।

বুড়ো বয়সে শরীরে কফ পিত্ত বায়ুর অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শরীর দুর্বল থাকে। তার সাথে মন মেজাজও খিটখিটে হয়ে যায়। তখন অন্যের আচরণও নিজের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে, আবার নিজের আচরণও অন্যের কাছে বিরক্তিকর দাঁড়ায়। শেষে বিক্ষুব্ধ ও হাহুতাশ ভাব নিয়ে মনে মনে বলতে থাকবো 'কেন বেঁচে আছি? পোড়া যমও আমাকে নিচ্ছে না। এখানে এই সব শয়তানদের কাছে আমি থাকতে চাই না।'

সেই জন্য নিজের মনকে শ্রীহরিপাদপদ্মে রাখার তাগিদে পিতার পঞ্চাশ বছর বয়স হলে পুত্রের হাতে গৃহ-পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করার বৈদিক পন্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন সেরকম উপযুক্ত বনও নেই। ফল ফুল পাতাও নেই যা খেয়ে নিজের মতন জীবন যাপন করা যাবে।

সুতরাং ছেলে-বৌমার আনুগত্যেই থাকতে হবে। যতটা সম্ভব বেশী করে হরিনাম গ্রহণ করতে হবে। কাউকে মোটেই বিব্রত করা যাবে না। এমনকি যম ঠাকুরকেও বকা যাবে না।

প্রশ্নোত্তরে - **সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

আমরা কেন শ্রীমতী রাধারাণীর পূজা করি?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

যদি রুক্মিনী কৃষ্ণের বিবাহিত বৈধ মহিষী হন তাহলে আমরা কেন শ্রীমতী রাধারাণীর পূজা করি? তাহলে রাধাকৃষ্ণ পূজা অপেক্ষা রুক্মিনী কৃষ্ণের পূজা করা সঙ্গত এবং উত্তম নয় কি?

রুক্মিনীর পূজা করা মহিমান্বিত, চমৎকার এবং আমাদের তা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে ভক্তরা রুক্মিনী কৃষ্ণের পূজা করে এমন বহু মন্দির আছে যেখানে রুক্মিনী কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ বর্তমান। কিন্তু অদ্যাবধি মহান যোগীগণ রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কটিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। রাধাকৃষ্ণের এই চিন্ময় প্রেমের সম্পর্কটি জড়জগতের কোন কিছুর সঙ্গেই সমতুল্য নয় এমন কি পারমার্থিক জগতেও নয়।

রাধা এবং কৃষ্ণ কি বিবাহ করেছিলেন?

হ্যাঁ। রাধা এবং কৃষ্ণ শাশ্বত রূপে বিবাহিত। তারা চিন্ময় রূপে অভিন্ন। যেমন আমাদের পিতামাতা আমাদের জন্মের পূর্বে বিবাহ করেন অনুরূপ ভাবে রাধা এবং কৃষ্ণ সৃষ্টির প্রাক্কালে বিবাহ করেন। যেমন আমাদের পিতামাতা আমাদের কাছে তাদের বিবাহ প্রমাণ করার জন্য পুনরায় বিবাহ করেন না। অনুরূপ ভাবে আমাদের চিন্ময় পিতামাতা রাধা এবং কৃষ্ণ তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক এই জগতে প্রমাণ করার জন্য পুনরায় বিবাহ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ব্রজধাম বৃন্দাবনে এরকম একটি বিখ্যাত লীলা বর্তমান সেখানে ব্রহ্মাদেব স্বয়ং রাধা এবং কৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন করেছিলেন যখন তাঁরা বৃন্দাবন এবং বর্ষানাতে বাল্যলীলা বিলাসে নিয়োজিত ছিলেন।

রাধারাণী লক্ষ্মীদেবীর অবতারের উৎস—

কৃষ্ণ হলেন বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে বিরাজিত বিষ্ণু এবং নারায়ণ অবতারের উৎস। অনুরূপভাবে রাধারাণী হলেন কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। তিনি হলেন সমস্ত ব্রজ গোপিকাদের উৎস এবং ঐশ্বর্যদেবী লক্ষ্মী দেবীরও উৎস। যেখানে কৃষ্ণ আছেন রাধাও সেখানে বিরাজমান। তাই কৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে তখন শ্রীমতি রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং আনন্দ প্রদানের জন্য নিজেকে লক্ষ্মী স্বরূপা রুক্মিনী রূপে বিস্তার করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন। বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী, লক্ষ্মী, সৌভাগ্য দেবী হলেন শ্রীমতি রাধারাণীর অংশ প্রকাশ। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণু-মূর্তি রূপে অসংখ্য প্রকাশ বিদ্যমান। অনুরূপভাবে তাঁর আহ্লাদিনী শক্তি রাধারাণীরও অগণিত লক্ষ্মী রপের প্রকাশ বর্তমান।" (কৃষ্ণ পরমপুরুষোত্তম ভগবান, অধ্যায়-৪৭)

রাধারাণী ব্যতীত কৃষ্ণ, কিরণ ব্যতীত সূর্যের ন্যায়। কৃষ্ণ হলেন পরম ভোক্তা এবং রাধারাণী হলেন সমস্ত আনন্দের উৎস। চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে লক্ষ লক্ষ গোপী বিরাজ করেন এবং এই সমস্ত গোপীগণ সর্বদা কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে নিমগ্ন। সমস্ত গোপীগণই মহান ভক্ত এবং তারা ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করেন কিন্তু কৃষ্ণ রাধারাণীর সঙ্গ পাওয়ার সাধ করতেন। যদিও গোপীরা কৃষ্ণসঙ্গ কামনা করতেন কিন্তু তারা যখন রাধা এবং কৃষ্ণকে এক সঙ্গে দেখতেন তখন আরও অধিক আনন্দ পেতেন।

রাধারাণী গোপীদের কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা বিলাস করার জন্য সানন্দে অনুমোদন দিতেন।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেবাতে যদি শ্রীমতি রাধারাণী সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি গোলোক বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ লীলাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদেরও অনুমোদন দিবেন। তিনি সর্বদাই চিন্ময় জগতে তাঁর সঙ্গে আমাদেরকে চান। তিনি কখনো চান না যে আমরা দুর্দশাগ্রস্ত হই। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি তাঁর সহায়তা কামনা করে কান্না করি তাহলে তিনি দ্রুত আমাদেরকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবেন।

রাধা বৃন্দাবনে এক দুর্দশাগ্রস্ত জীবকে রক্ষা করেছিলেন—

একদা বৃন্দাবনে কিছু বালক একটি শৃগালকে বিব্রত করছিল তারা তাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করছিল এবং তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল। শৃগালটি তার প্রাণ রক্ষার তাগিদে দৌড়ে গিয়ে মাটিতে একটি গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়। যখন বালকেরা দেখল যে শৃগালটি গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে তারা তখন তার চারপাশে অগ্নিসংযোগ করে দিল। আগুনের তাপ অসহ্য ছিল। তাই শৃগালটি আর্তনাদ করতে লাগল এবং কান্না করতে লাগল। রাধারাণী নিকটেই ছিলেন। যখন কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন, তিনি তাঁর সখী ললিতাকে বললেন ঘটনাটি জানতে। তিনি বললেন ''এই হলো ব্রজভূমি, আমার স্থান, এখানে কারও কষ্ট পাবার কথা নয়।''

ললিতা সখী সত্ত্বর সেখানে গেলেন এবং দেখলেন বালকেরা শৃগালটিকে কষ্ট দিচ্ছে, তিনি তাদেরকে বিতাড়ন করলেন। তিনি শৃগালটিকে গর্ত থেকে উদ্ধার করলেন এবং শৃগালটি তখন প্রাণভয়ে কাঁপ ছিল। শৃগালটিকে রাধারাণীর কাছে নিয়ে আসা হলো, শৃগালটি রাধারাণীর পদতলে পতিত হলো এবং তিনি শৃগালটিকে কৃপা করলেন। তিনি শৃগালটিকে একটি গোপীদেহ দান করলেন এবং এই গোপীকে চিন্ময় জগতে রাধারাণীর পার্ষদ হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হলো। শৃগালটির ঐকান্তিক ক্রন্দন শ্রীমতি রাধারাণীর কৃপাদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছিল।

এই ঘটনাটির অর্থ হলো যে শৃগালটির গর্তে আবদ্ধ হওয়াটি হলো জড় বন্ধন। শৃগালটি আমাদের অর্থাৎ জীবাত্মার প্রতিনিধি। গর্তের চতুর্দিকে আগুন হলো জড় জগতের যন্ত্রণা। শৃগালটির উচ্চৈস্বরে কান্না হলো জড় জগতে আমাদের অসহায় আর্তনাদ। কিন্তু শৃগালটির ন্যায় আমরা যদি রাধারাণীর কৃপালাভের জন্য কান্না করি তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের সকল দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবেন। তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দেবেন, ব্রজধামে তাঁর সঙ্গে থাকার এবং তাঁকে সেবা করার সুযোগ প্রদান করবেন যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজা এবং তিনি রাণী।

রাধারাণীর পূজা করার গুরুত্ব—

জড় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার জন্য, আমাদের রাধারাণীর পূজা করা উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক মহান বৈষ্ণব আচার্য তিনি তার রচিত গ্রন্থ গীতাবলীতে রাধারাণীর পূজার মাহাত্ম্য গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা / কৃষ্ণভজন তবে অকারণ গেলা।''—'যদি কারও অভিলাষ রাধা ভজনে না জন্মায় তাহলে তার তথাকথিত কৃষ্ণভজন পূর্ণরূপে অর্থহীন। একদা যখন এক ব্যক্তি রাধাকুণ্ডে বসে কৃষ্ণভজন করছিলেন এবং কৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করছিলেন তখন ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করেন, 'আমরা শ্রীমতি রাধারাণীর ভৃত্য এবং তাঁর ভৃত্যের সেবক। এটিই হলো রূপ গোস্বামীর সমস্ত অনুগামীদের মনোভাব।'

আমরা রাধারাণীর ভক্ত না হয়ে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করতে পারি না। তিনি দেবদেবীদের মতো নয়। তিনি জড়জগতের যে কোন দেব-দেবীর থেকে মহান। কৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সমস্ত জীবের পরম পিতা। রাধা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা কান্তা, তিনি হলেন নিখিল বিশ্বের পরম মাতা। আমাদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা আছে যে পিতা অপেক্ষা মাতাকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ মায়েরা কোমলহৃদয়া। তাই আমাদের চিন্ময় মাতা রাধারাণীর হৃদয় মাখনের মতো কোমল। তাঁকে অনায়াসে সন্তুষ্ট করা যায় এবং আমরা জানি কৃষ্ণ মাখন পছন্দ করেন।

সুতরাং যদি আমরা ঐকান্তিক সেবা দ্বারা রাধারাণীকে আকৃষ্ট করতে পারি তাহলে পরিশেষে আমরা কৃষ্ণের কৃপা পাব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতাবলীতে আরও লিখেছেন। ''যদি কেউ নিজেকে রাধারাণীর একজন বিনীত ভৃত্য বলে মনে করে তখন সে অতি সত্ত্বর গোকুলেশ্বরকে লাভ করতে পারে।''

কাঁচা আম ও কমল কাঁকরীর আচার

উপকরণ ঃ কাঁচা আম ২ কিলো। কমল কাঁকরী ৫০০ গ্রাম (পদ্ম ফুলের বীজের খই, বাজারেও পাওয়া যায়)। আদা ২০০ গ্রাম। কাঁচা লংকা ১০০ গ্রাম। করমচা ২০০ গ্রাম। লবণ ১০০ গ্রাম। হলুদ গুঁড়ো ২ টেবিল-চামচ। শুকনো লংকা গুঁড়ো ৪ টেবিল-চামচ। মেথি ২ টেবিল-চামচ। মৌরী ৪ টেবিল-চামচ। রাই সরষের গুঁড়ো ১০০ গ্রাম। হিংগুঁড়ো ১ টেবিল-চামচ। কালো জিরা ১ টেবিল-চামচ। জোয়ান ১ টেবিল- চামচ। সরষের তেল ১ কিলোগ্রাম।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ আদা কুচি করুন। কাঁচা লংকা কুচি করুন। শুকনো কড়াইতে মেথি ও মৌরী ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করুন। আম ও কমল কাঁকরী ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন। করমচা দুই ফালি করে কাটুন। আম, কমল কাঁকরী, করমচার সঙ্গে মেথি, হলুদ ও লবণ মাখিয়ে সারা রাত ঝরতে দিন।

পরদিন বাকি অন্য সব মশলাগুঁলো ওতে মাখিয়ে দিন। একটা কাঁচের জারে মাখানো আম ভরে দিয়ে তাতে সরষের তেল ঢেলে দিন। দেখবেন আচারটি যেন তেলে সম্পূর্ণ ডুবে থাকে।

তারপর প্রতিদিন আচার জারটি রোদে রাখুন। ১০দিন পরে এই আচার শ্রীভগবানকে নিবেদন যোগ্য হবে।

— শচীপ্রিয়া ভক্তি দেবী দাসী

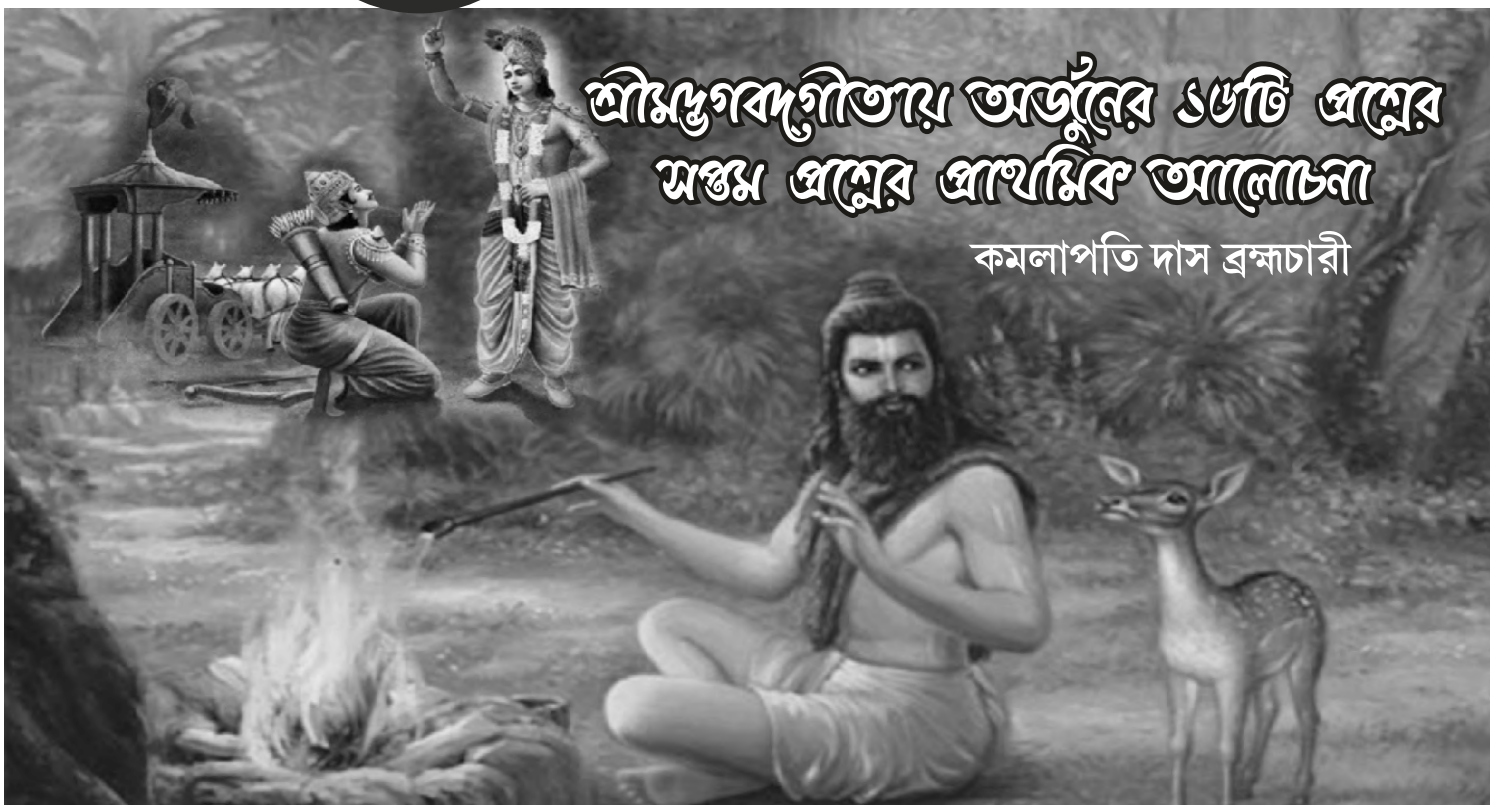

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনের ১৬টি প্রশ্নের সপ্তম প্রশ্নের প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

হরে কৃষ্ণ, অর্জুনের সপ্তম প্রশ্ন ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৭ নং শ্লোক, কেন এই রকম প্রশ্ন করেছেন অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রদান করেছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা করার চেষ্টা করব মাত্র।

সমগ্র গীতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাইছেন অর্জুন যেন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভগবান এই অধ্যায়ে বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছেন যোগীর মুখ্য কাজ তার মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা । ২৫-২৭ নং শ্লোক পর্যন্ত প্রত্যাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যোগী কিভাবে চঞ্চল ও অস্থির মনকে ধৈর্যের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে পরম সুখে বাস করেন। ৩৩নং শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন যোগ সাধনা করতে গেলে মনকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন সেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর নাই। মনের চঞ্চল স্বভাব বশতঃ তিনি তার স্থায়ী অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না। চিন্তা করে দেখুন, কোন্ অর্জুন বলছেন—আমার পক্ষে যোগারুঢ় স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন, কলিযুগের মানুষের পক্ষে গৃহ ত্যাগ করে নির্জন স্থানে যোগাভ্যাস করা সম্ভব নয়। এমন কি বিভিন্ন যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে গিয়ে যোগপদ্ধতির অন্ধানুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তারা কেবল সময়ের অপচয় করছে। তাই অর্জুন মনের চঞ্চলতাকে আরো ভালভাবে বোঝাবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একটা উদাহরণ সহযোগে বললেন (৬/৩৪)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন এটা সত্যি তবে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সম্ভব; দুর্দমনীয় ও চঞ্চল মনকে বশীভূত করা যায়। অভ্যাস মানে---সব সময় শ্রীকৃষ্ণের কার্যে যুক্ত থাকা। কিভাবে নিরন্তর যুক্ত থাকা

যায় কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। হরিনাম জপ করার মাধ্যমে, কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের যে কোন সেবা করার মাধ্যমে যুক্ত থাকতে পারেন।

বৈরাগ্য মানে---কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয়গুলি ত্যাগ করা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৩৬নং শ্লোকে বলতে চাইছেন অসংযত ব্যক্তির পক্ষে আত্ম উপলব্ধি অসম্ভব। কারণ যোগের সফলতা নির্ভর করে মনকে বশ করার উপর। তাই যার মন সংযত এবং যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করেছেন তিনি যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারেন অর্থাৎ হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। ঐ সময় অর্জুনের মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে যদি কেউ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাহলে তার পক্ষে কি যোগ সাধনায় সফলতা লাভ করা সম্ভব। ভগবান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন, মনকে সুখভোগে নিয়োজিত রেখে যোগের অনুশীলন করাটা জল ঢেলে আগুন জ্বালাবার চেষ্টার সামিল মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন লোক দেখানো যোগসাধনা সময়ের অপচয় মাত্র এবং পরমার্থ সাধনের পথে বাধা স্বরূপ।

অর্জুন যদিও জানেন ভগবান কথা দিয়েছেন ২।৪০ নং শ্লোকে ''ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোন ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।'' তবুও আমাদের মঙ্গলের জন্য পুর্নবার নিশ্চিত হতে চাইছেন, যেহেতু নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করার পরেও অনেকেই বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হতেই পারে তাই ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতি কৃষ্ণ গচ্ছতি।।

৬।৩৭গীতা

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ ! যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগে যুক্ত থেকে চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ভ্রষ্ট হয়ে যোগে সিদ্ধি লাভ করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থ যোগীর কি গতি লাভ হয় ?

অর্জুনের চিন্তা দেখুন — আমাদের মনের সমস্ত ভুল ধারণাগুলিকে দূর করে দেওয়ার জন্য ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন — কেউ যদি ভক্তি করার জন্য সংসার ত্যাগ করে ভগবানের চরণে শরণ নেওয়ার জন্য গেলেন কিন্তু কোন কারণবশতঃ সিদ্ধি লাভ করতে না পেরে ফেল করে সংসারে ফিরে এলেন। ঐ ফেল করা যোগী বা ভক্তের কি গতি হবে ? শ্রীকৃষ্ণ কি ভাববেন যে, যেহেতু একবার এসে পাশ করতে পারে নি তাই সারা জীবনের জন্য আমার

কাছে আসার দরজা বন্ধ হয় যাবে? একজন দয়াল পিতার মতো হয়ে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।

গীতা ৬।৪০

পরমেশ্বর ভগবান বললেন---হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদের ইহলোক ও পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। হে বৎস! তার কারণ কল্যাণকারীর কখনও অধোগতি হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন --- ভগবানের সেবা যতই নগণ্য হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা বিফলে যায় না। জড় জাগতিক স্তরে যে কোন কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন তাৎপর্যই থাকে না। কিন্তু ভগবৎ সেবা সুসম্পন্ন না হলেও বিফলে যায় না। তার সুফল চিরস্থায়ী থাকে। ভগবানের সেবা একবার যে শুরু করেছে, তার আর বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে না। এক জন্মে যদি তার ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ নাও হয়। তবে তার পরের জন্মে সে যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করবে। জাগতিক দিক থেকে যদি বিচার করি কেউ প্রথম ক্লাস থেকে পাশ করে এম.এ পর্যন্ত পড়ে মাষ্টারী চাকরী করছে। ঐ ব্যক্তি মারা যাবার পর আবার প্রথম ক্লাস থেকে পড়তে হবে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা।

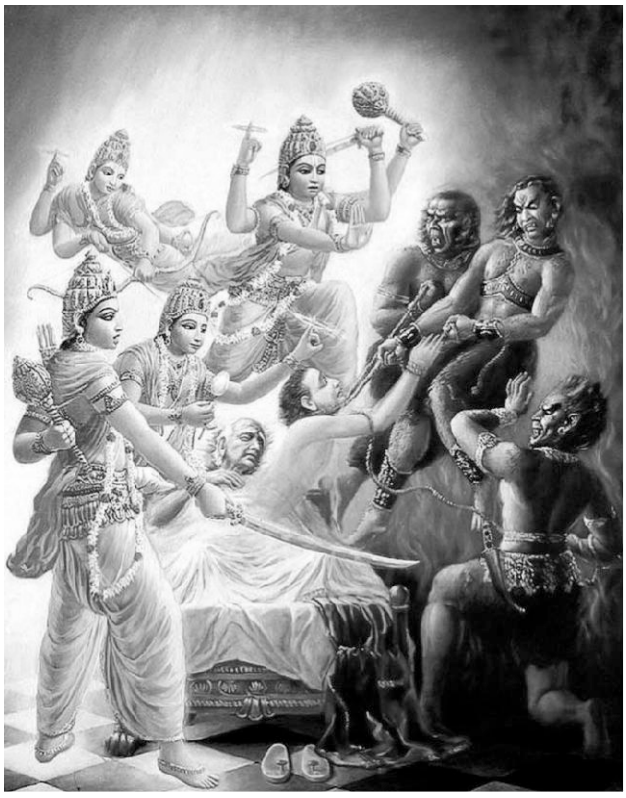

একসময় বিদেশে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের সামনে বসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন,—ঐ সময় একজন নেশাখোর ব্যক্তি গুন্ গুন্ শব্দ করতে করতে টয়লেট ঘরে প্রবেশ করলেন,—দেখলেন কোন টয়লেট পেপার নেই, তখন হন্ হন্ করে বেরিয়ে এসে দোকান থেকে একটা টয়লেট পেপারের রোল কিনে নিয়ে এসে টয়লেটের ভিতর রেখে চলে গেলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন এ ব্যক্তি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে গেল এটার কখনও ক্ষয় হবে না। যেহেতু ঐ টয়লেটটি ভক্তরা ব্যবহার করে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির ফল চিরস্থায়ী থাকে বলে ক্রমান্বয়ে জীবকে মায়ামুক্ত করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানত পারি অজামিল ছোট বেলায় ভক্তিতে যুক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এক বেশ্যার পাল্লায় পড়ে ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল কিন্তু অন্তিম সময়ে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। ভরত মহারাজ ভগবদ্ভক্তি করতে এসে এক হরিণ শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হরিণ জন্ম লাভ করলেন কিন্তু ঐ জন্মেও তার ভগবদ্ভক্তির কথা মনে থাকতে তার মাকে অর্থাৎ হরিণীকে ছেড়ে — পুলহ - পুলস্ত ঋষির আশ্রমে থেকে বাকী জীবনটি কাটিয়ে পরবর্তী জন্মে জড়ভরত নাম ধারণ করে ভগবদ্ভক্তির যেটুকু বাকী ছিল তা পূরণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গেলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অপরাধ করার ফলে মা পার্বতীর দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে মহারাজ চিত্রকেতু অসুরদেহ লাভ করে বৃত্রাসুর নাম ধারণ করে অসুরের মতো কার্যকলাপ করলেও পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা বিস্মৃত হন নি। অন্যদিকে শ্রীনারদমুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন

(১।৫।১৭ভাঃ) ''কেউ যদি সব রকমের জড় জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়, তাহলে তার কোন রকম ক্ষতি বা পতনরূপী অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে সর্বতোভাবে স্বধর্মাচরণে রত অভক্তের কোনই লাভ হয় না।''

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—ভগবানের সেবা যতই নগণ্য হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা বিফলে যায় না। জড় জাগতিক স্তরে যে কোন কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন তাৎপর্যই থাকে না।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কেউ কিছু বৎসর ভক্তি করার পর কোন অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করার পর বা সংসারের চাপে ভক্তি পথ ছেড়ে দিলেন। আবার কেউ দীর্ঘকাল ভক্তি করার পর মোহিনী মায়ার প্রভাবে ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হলেন। দুইজনের গতি কি এক হবে? শ্রীল প্রভুপাদ ৪১নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—যাঁরা অল্প সাধনার পর পতিত হয়েছেন, তাঁরা স্বর্গে যান, যেখানে প্রচুর টাকা খরচ করে দান বা স্কুল বা কলেজ ও হাসপাতাল তৈরী করে পুণ্যবানেরা প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। সেখানে দীর্ঘকাল নানা রকম সুখভোগ করার পরে তাঁরা আবার এই জগতে ফিরে আসেন এবং সৎ ব্রাহ্মণ অথবা ধনী বণিকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। আর যাঁরা দীর্ঘকাল সাধন করার পর পতিত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের জাগতিক কামনা-বাসনা তৃপ্তিসাধন করার পূর্ণ সুযোগ পান এবং তারপর ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ধরনের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করার সুযোগ পান।

অর্জুনকে ভগবানের কাছে সপ্তম প্রশ্নের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারলাম পারমার্থিক সাধনা বা যোগসাধনা কখনই বিফলে যায় না। ভগবানের কৃপার ফলে পরমার্থ সাধকেরা কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধি লাভ করবার জন্য বার বার সুযোগ পান।

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ ৭ম পর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়
নারদমুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

অধ্যায়ের সারাংশ ঃ

শ্লোক ঃ ১–২০

ব্যাসদেব নারদ মুনির কাছে জানতে চাইলেন, ঋষিরা চলে যাওয়ার পর তিনি কি করেছিলেন। নারদ মুনি বর্ণনা করলেন যে, সর্পাঘাতে তাঁর মাতার মৃত্যুর পর তিনি ভ্রমণ শুরু করেছিলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন নগর, গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী .....গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত্র, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলেন। একদা তিন জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। তারপর তিনি তার অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেন। পরমাত্মা তার সম্মুখে প্রথমে আবির্ভূত হয়ে তারপর অপ্রকট হন।

শ্লোক ঃ ২১–২৫

নারদের দুঃখকে দূর করার জন্য ভগবান তাঁকে বললেন যে যার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়নি, তিনি ক্বচিৎ তাঁর দর্শন লাভ করেন। ভগবান প্রকাশ করলেন যে নারদ যে একবার মাত্র তার দর্শন লাভ করলেন, তা কেবল তাঁর প্রতি নারদের আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। ভগবানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করার পর নারদ মুনি ব্যাসদেবের নিকট তাঁর পরবর্তী জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছিলেন তা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ঃ ২৬–৩৮

নারদ তারপর তাঁর দেহত্যাগ এবং নারদ মুনি রূপে তাঁর জন্মের কথা বর্ণনা করলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন। তিনি মুক্ত মহাকাশচারী। নারদ ব্যাসদেবের প্রতি তাঁর নির্দেশের সমাপ্তি করলেন এবং তারপরে সূত গোস্বামী নারদ মুনির প্রস্থান বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি নারদমুনির মহিমা বর্ণনা করলেন।

ব্যাসদেব নারদ মুনির পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন। এভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে তত্ত্ব—অনুসন্ধানের বাসনা গতিশীল পারমার্থিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এই পন্থাকে বলা হয় সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা। নারদ মুনি পূর্ব জীবনে ছিলেন একজন দাসীপুত্র, সুতরাং কিভাবে তিনি সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীল ব্যাসদেব চেয়েছিলেন সকলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেই তত্ত্ব তিনি যেন ব্যক্ত

করেন।

যথার্থ ভক্তসঙ্গের প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয়, তার ফলে জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। শ্রীনারদ মুনির পূর্ব জন্মে কিভাবে তা হয়েছিল এই অধ্যায়ের তা ধীরে ধীরে বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ মুনি বললেন, এক সময় আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে। সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি। ভগবানের ভক্তরা সব কিছুকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। নারদ মুনি যদিও তখন একটি শিশু ছিলেন কিন্তু পারমার্থিক জীবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া মাত্রই তিনি আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি অনর্থক কার্যকলাপের এক মুর্হূতও নষ্ট না করে পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এভাবে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণ ক্ষেত্র। এইভাবে ভ্রমণ করে তিনি দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। তখন নদীতে স্নান করে, জল পান করে শান্তি দূর করেছিলেন। তারপর জনমানবশূন্য একটি অরণ্যে, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে অন্তরে পরমাত্মার ধ্যান করেছিলেন। শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজীবনে গৃহত্যাগ করার পর অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তির এই অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার ফলে তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। নারদ মুনি ক্ষণিকের জন্য সেই রূপ দর্শন করেছিলেন এবং সেই রূপ পুনরায় দর্শন না করতে পেরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সেই রূপের অন্বেষণ করার জন্য তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

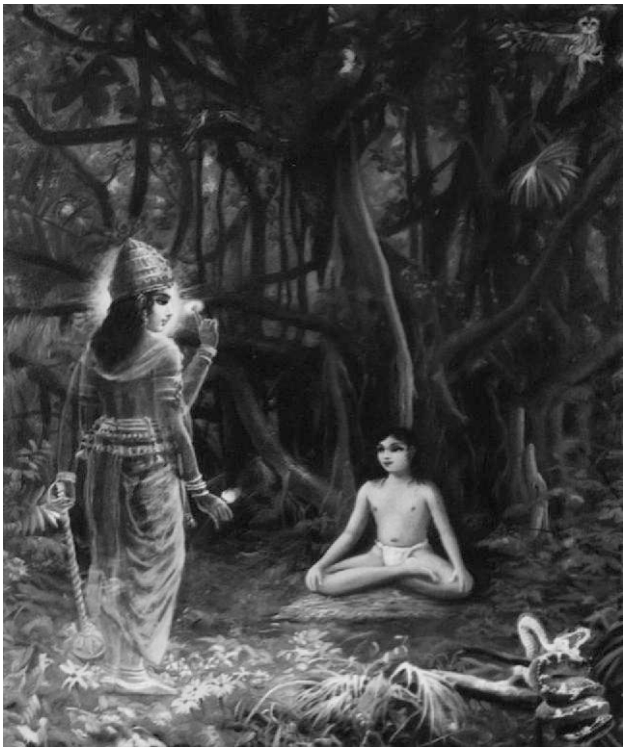

নারদ মুনি মনে করেছিলেন যে, যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি পুনরায় ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন, যেভাবে তিনি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি আর ভগবানের দর্শন পেলেন না। ভগবান বললেন, হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে। ভগবান নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান। বৈধী ভক্তির স্তরে অন্য কারও পক্ষে কিন্তু সরাসরি ভাবে ভগবানের সংস্পর্শ অনুভব করা সম্ভব নয়। নারদ মুনি যখন ভগবানের মধুর বাণী শুনতে পান, তখন তাঁর বিরহ বেদনা কিয়দংশ উপশম হয়েছিল। ভগবান বললেন, হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। কেন না, তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হবে। নারদ মুনির কোন জড় বাসনা ছিল না। কেবল ভগবানের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য ভগবান তাঁকে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভগবান বললেন, অল্পকালের জন্যও যদি সাধু-সেবা করা হয়, তাহলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা কখনই বিফল হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু নিত্য, তাই মতি বা বুদ্ধি যখন তাঁর সেবায় যুক্ত হয়

অথবা কোন কিছু যখন তাঁর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখন তাও নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

নারদমুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। নারদমুনি ব্যাসদেবকে বললেন, হে ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক যেভাবে তড়িৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলোকের বিকাশ হয় ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জড় দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময় দেহ লাভ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে একই সঙ্গে হয়ে থাকে। আচার্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মার পুত্ররূপে নারদ মুনির আবির্ভাবও একটি দিব্য লীলা। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব ভগবানের আবির্ভাবের সমপর্যায়ভুক্ত।

ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সমস্ত মহর্ষিরা আবির্ভূত হন এবং নারদ মুনিও তখন আবির্ভূত হন।

অর্থাৎ নারদ মুনি তাঁর একই চিন্ময় শরীর নিয়ে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন মানুষ একই শরীরে জেগে ওঠে। নারদ মুনি জড়জগৎ এবং চিন্ময় জগৎ সমস্ত জগতে ভ্রমণ করতে পারেন। ঠিক যেমন ভগবান নিজে তাঁর সৃষ্টির যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন।

নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণ মহিমা কীর্তন করেন। নারদ মুনিকে ভগবান যে বাদ্যযন্ত্রটি দিয়েছিলেন, সেই বীনা যখনই নারদ মুনি বাজিয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন তখনই ভগবান সেখানে আবির্ভূত হন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত লাভের জন্য ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন না। পক্ষান্তরে, ভগবানের মহিমা কীর্তন ভগবানের থেকে অভিন্ন বলেই তিনি তা কীর্তন করেন। নারদ মুনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টায় নৈরাশ্য জর্জরিত মানুষ যদি যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তারা যেন চিরন্তন ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে অর্থাৎ কার্যের পরিবর্তন না করে কেবল উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করার মাধ্যমেই মানুষ তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে।

> ভগবান বললেন, অল্পকালের জন্যও যদি সাধু-সেবা করা হয়, তাহলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা কখনই বিফল হয় না।

ব্যাসদেবের প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির পন্থার শুরু থেকে চিন্ময় স্তর লাভ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে সাধু সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির বীজ তাঁরা হৃদয়ে রোপিত হয়। এই শ্রবণের ফলে জড় বিষয়ের প্রতি তাঁর এতই অনাসক্তি আসে যে তিনি তাঁর একমাত্র মায়ের মৃত্যু সংবাদকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের জ্ঞানালোক প্রদান করার জন্য নারদ মুনি সর্বত্র বিচরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেটি সম্পাদন করাই হচ্ছে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

ওয়ার্ল্ড বুক অব্ রেকর্ডস্ ইসকন গুরুগ্রামকে সার্টিফিকেট অব্ কমিটমেন্ট প্রদান করে সম্মানিত করল

কোভিড অতিমারীর সময় ইসকন গুরুগ্রামের ভক্তগণ আর্তজনের যে অনুপম সেবা করেছেন তার সম্মানার্থে ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস (ডব্লু বি আর) ইসকন গুরুগ্রামকে একটি সার্টিফিকেট অব্ কমিটমেন্ট পুরস্কার প্রদান করল। ইসকন গুরুগ্রামের প্রেসিডেন্ট রামভদ্র দাস এই পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন। ইসকন গুরুগ্রামের ভক্তগণ বিভিন্ন প্রকারের কোভিড সেবার সূচনা করেছেন যার মধ্যে আর্তদের গরম খাবার বিতরণ, কোভিড পরামর্শ, কোভিড যোগ সেবা এবং প্রাত্যহিক প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গুরুগ্রাম হরিয়ানায় অবস্থিত এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লী ছিল হরিয়ানার সর্বাধিক কোভিড আক্রান্ত জেলা সেখানে সেকেন্ড ওয়েভে প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ জন লোক সংক্রমিত হয়েছেন।

ইসকন গুরুগ্রামের রিলিফ কিচেন (ত্রাণ রন্ধনশালা) ২০২১ সালের ২১শে এপ্রিল শুরু হয়েছিল এবং আর্ত পরিবারদের ও বঞ্চিত পথবাসীদের শত শত গরম খাবার বিতরণ করেছে। বিতরণকারী কর্মী এবং যানের অপ্রতুলতার মতো বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এই কিচেন টিম আর্তজনের সেবায় খাদ্য সরবরাহের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

সংক্রমিত পরিবারগুলিকে প্রিয়জনের শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য প্রাত্যহিক কীর্তন এবং প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। ইসকন গুরুগ্রামের জনসংযোগ আধিকারিক পাদসেবন ভক্ত দাস এই প্রচেষ্টার সূচনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে ''কোভিড আক্রান্ত মানুষের ক্রমাগত খাদ্য বিতরণের জন্য আমাদের অনুরোধ করার ফলস্বরূপ তাদের সহায়তা করাই এই কোভিডের বহির্মুখী সেবাকার্য সূচনার প্রাথমিক কারণ। যে মুহূর্তে আমরা তাদের সংস্পর্শে আসি, আমাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে আমরা তাদের যোগ, পরামর্শদান, প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও সহায়তা করতে পারি।''

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে শ্রীল প্রভুপাদের মুদ্রা প্রকাশ

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মহান ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে তাঁকে সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মাননীয় ভারত সরকার ভারতীয় ১২৫ টাকা মূল্যের একটি স্মরণ মুদ্রা প্রকাশ করছেন।

মাননীয় ভারত সরকারের এই ঐতিহাসিক প্রয়াসটি কখনোই ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস, হর্ষগোবিন্দ দাস, বংশীধারী দাস এবং প্রদ্যুম্ন প্রিয় দাসের উৎসর্গীকৃত প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব হতো না।

এই মুদ্রাটি আশা করা যায় শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম ব্যাস পূজা (জন্ম বার্ষিকী) ১লা সেপ্টেম্বর ২০২১ এ প্রস্তুত হবে যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস জন্মাষ্টমীর একদিন পরে উদযাপিত হয়। প্রত্যেক স্মরণিকা মুদ্রাটির সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান ও সাফল্য সমন্বিত একটি করে সহায়িকা পুস্তক দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি মুদ্রা মিশ্রণে পঞ্চাশ শতাংশ রৌপ্য ও চল্লিশ শতাংশ তাম্র বর্তমান।

ইসকন সম্প্রচার এবং এসপি ১২৫ (শ্রীল প্রভুপাদ ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি) এই সুসংবাদটি আন্তর্জাতিক ভক্ত

সম্প্রদায়ের বিনিময় করেছে যাতে করে সকলে ব্যক্তিগত মুদ্রা ক্রয় করার জন্য আবেদন করতে পারে। মুদ্রা প্রাপ্তি ও সরবরাহের জন্য একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে যাতে সকলেই মসৃণ ভাবে এই মুদ্রা প্রাপ্ত করতে পারে প্রত্যেক মুদ্রার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ৪৬০০ টাকা সঙ্গে বহন শুল্ক। আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই ২০২১।

পুরস্কার-বিজয়ী ভক্তিচারু স্বামী তথ্যচিত্রটি ২৪শে জুলাই প্রথমবার প্রদর্শিত হল

''সিকিং শেল্টার ঃ দ্য লাইউ এণ্ড লিগ্যাসি অব্ ভক্তিচারু স্বামী'' শীর্ষক নতুন একটি ৩৭ মিনিট দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ইসকন গুরুর তিরোভাব দিবসের পৃথিবীব্যাপী উদ্‌যাপনের অংশ স্বরূপ ইসকন নিউজ এবং ইউটিউবে ২৪শে জুলাই প্রথম প্রদর্শিত হয়।

এই তথ্যচিত্রটিতে তাঁর জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী এবং কৃতিত্বগুলি তুলে ধরার সাথে সাথে তাঁর নিজস্ব কথা, সঙ্গীত ও শিল্পের মাধ্যমে তাঁর পরম আশ্রয়ের (শরণাগতি) অন্তর্মুখী সন্ধানের একটি আভাসও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামীর নিকট শরণাগতি, অথবা পরম আশ্রয়ের প্রার্থনা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি শরণাগতি শীর্ষক একটি সঙ্গীতের অ্যালবামও প্রকাশ করেছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ও প্রক্রিয়ার উপর অনেক প্রবচন প্রদান করেছেন।

ক্রিশ্রিনা ডাঙ্কা, পিএইচডি. (কৃষ্ণলীলা দাসী) একজন বহু তথ্যচিত্র পুরস্কার বিজয়ী চিত্রপরিচালক এই তথ্যচিত্রটি রচনা এবং পরিচালনা করেছেন।

''সিকিং শেল্টার''-এ যেমন সংগ্রহশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও চিত্রের মাধ্যমে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামীর জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী এবং কৃতিত্বসমূহ বিবৃত হয়েছে আর সাক্ষাতকারের মাধ্যমে স্বামী নিজের কথায়ও তাঁর কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণলীলা বলেন, ''অবশ্যই ৩৭ মিনিটে তাঁর অত্যাশ্চর্য কৃতিত্বকে সামগ্রিকরূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কিন্তু হাজার হাজার মানুষের জীবনের উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তার মহিমার উপর স্বল্প আলোকপাত আমরা করতে পারি।''

ক্রমবর্ধমান প্রগতি হচ্ছে ইসকন পাকিস্তানে

পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমে এক গ্রাম্য পাহাড়ী এলাকা; সমগ্র বালুচিস্তান ব্যাপী এই বছরের মে এবং জুন মাসে একটি প্রচারমূলক যাত্রা আয়োজিত হয়েছিল।

পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের তিনটি মন্দির আছে সেগুলি দেশের রাজধানী করাচি, লারকানা, সিন্ধে অবস্থিত এবং হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু পাঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে থারি মিরয়া ও হায়দ্রাবাদের হরিমন্দিরে পাঁচটি সেন্টার রয়েছে এবং বালুচিস্তানের খুজদার ও কোয়েটায় সেন্টার আছে এবং আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খুজদার মন্দিরের সহ সভাপতি রামসখা দাস একটি নিরন্তর প্রচার যাত্রার সূচনা করেন। বর্তমানে বালুচিস্তান যাত্রাকে অপর এক অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য খুজদার মন্দিরের টেম্পল প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় দাস (ভ্রমণ এবং সমন্বয় সাধন ক্ষেত্রে) সহায়তা করছেন।

খুজদার, লুঙ্কি, কোয়েটা এবং সাসটুং প্রভৃতি শহরে সারামাস ব্যাপী কর্মসূচী হয়েছে।

প্রত্যহ রামসখা দাস বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন, ভাগবত আলোচনা করেন, গ্রন্থ বিতরণ করেন এবং স্থানীয় উৎসাহী ভক্তদের আয়োজন খাদ্য (প্রসাদ) বিতরণ করেন।

প্রতিদিন সকালে ভাগবত-গীতা ক্লাস এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠানের সাথে সাথে গৃহে গৃহে অনুষ্ঠানও হয়। শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী উদ্‌যাপিত হয় এবং একাদশী অনুষ্ঠানও পরিচালিত হয়। স্থানীয় অধিবাসী এবং ভক্তগণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে রামসখা দাসের সাধুসঙ্গকে গ্রহণ করেন। যাত্রাকালে ভক্তগণকে 'ভগবদ্‌গীতা যথাযথ' এবং 'সিভিলাইজেশন এণ্ড ট্রান্সেনডেন্স'' গ্রন্থ বিতরণ করা হয়। রামসখা দাস তার পরবর্তী যাত্রার জন্য বিবিটির কাছে আরও গ্রন্থ সরবরাহের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

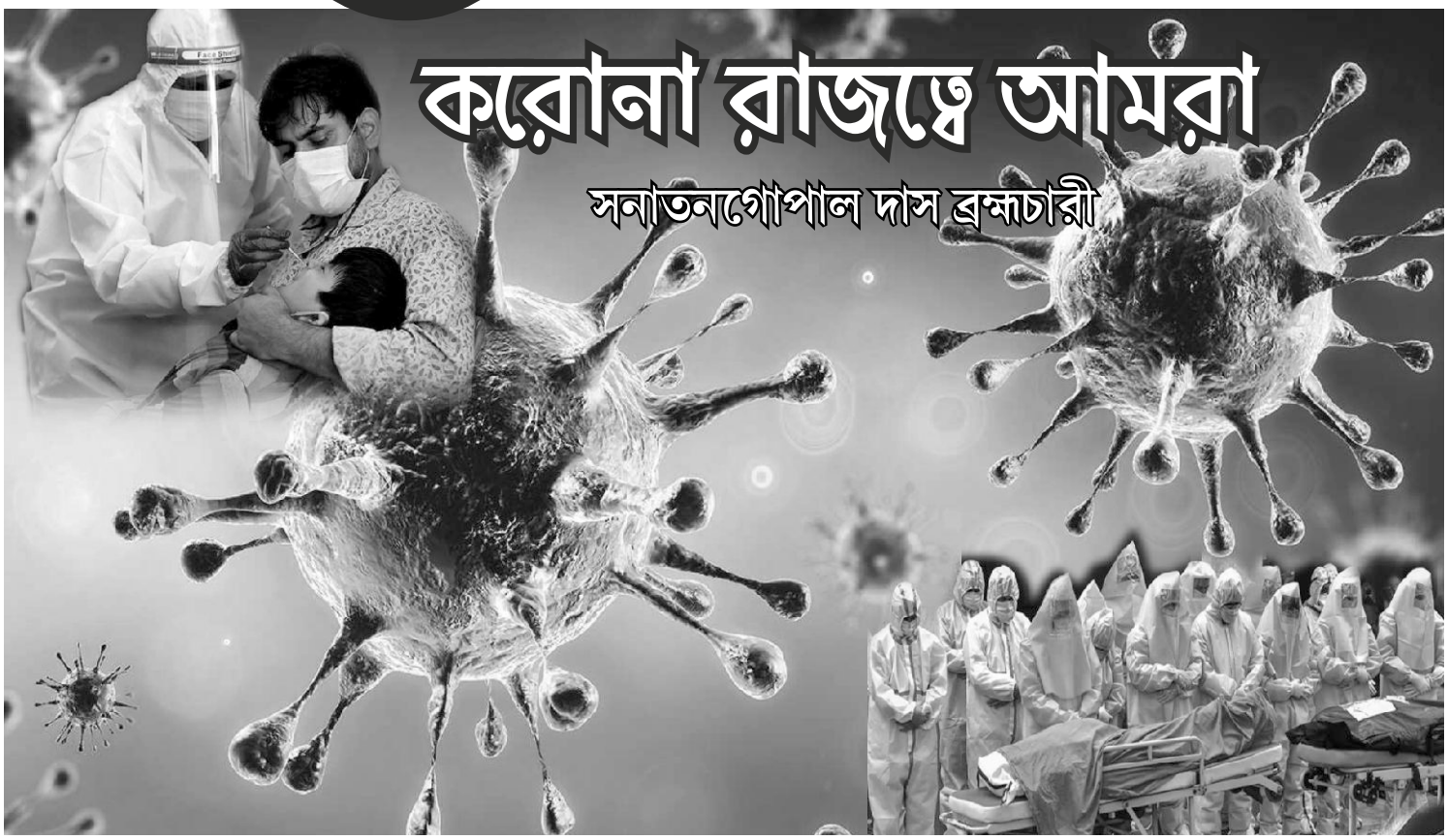

করোনা রাজত্বে আমরা

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

২০১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর সূর্য গ্রহণের পর থেকেই করোনা ভাইরাসের কথা শোনা যেতে লাগল। চীন দেশ থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ল। কেউ ভাবতে পারেনি যে, এরকম এক অতিমারীর কবলে পড়তে হবে।

ছোটবেলায় শুনতাম, পরের জিনিষ ছুঁবে না। এখন, পরের কি, ঘরের কি, কোন কিছু ছোঁয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকো। হাত দুটো স্যানিটাইজ করে নিতে হবে। কেউ কিছু জিনিষ দিয়েছে তো হাত স্যানিটাইজ করো। নিজের চোখ মুখ নাকও ছোঁওয়া নিষেধ।

গলায় গলায় ভাব করলে চলবে না। দূরে দূরে থাকো। ঠেলাঠেলি, জাপাজাপি, গা ঘেঁষাঘেঁষি ঢের হয়েছে। আর নয়। ফারাক রেখে দাঁড়াও। ছয় ফুট দূরে থাকো।

তুমি অনেক সন্দেহজনক। তোমার কাছে বসা যাবে না। বেশী বকর বকর করো না। মুখ বাঁধো। মুখোশ পরো। চুপ থাকো। এই সংসারে অনেক নাক গলিয়েছে। আর নয়। নাক ঢেকে রাখো। তিনপ্রস্ত কাপড় দিয়ে নাক মুখ বেঁধে রাখো। আর নয়। নাক ঢেকে রাখো। কথায় কথায় খক্ খক্ করে কাশি দিয়ে কফ থুথু ছিটাতে। এখন এসব দেখলে লোকে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে। দূর দূর করে তাড়িয়ে ছাড়বে।

অসুস্থ হয়ে পড়েছ? ঘরের আত্মীয় স্বজনেরাও তোমাকে এক ঘরে করে রাখবে। ঘরবন্দী থাকো, বাইরে বেরোবে না। তোমার কাছে কেউ গল্প করা তো দূরের কথা, এক সেকেণ্ডও থাকতে চাইবে না। যদি সম্ভব হয় তবে দুবেলা কিছু খাবার তোমার জানালার কাছে রেখে দেওয়া হবে।

ডাক্তারখানায় যাবে? হাসপাতালে প্রচুর ভীড়। ডাক্তার, নার্সরা হিমসিম খাচ্ছে। রোগীদের রাখার কোনও জায়গা নেই। রোগীদের শরীরের ভাইরাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরাও সংক্রামিত হয়ে মরণাপন্ন হচ্ছে। তবুও লোক হাসপাতালে যাচ্ছে। কত রকমের জটিল রোগ। যে রোগ হোক না কেন,

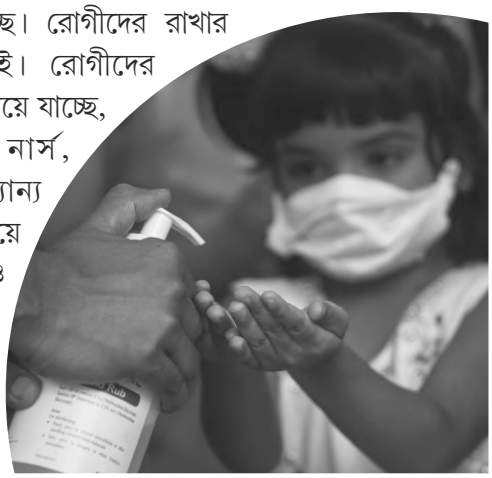

ওটাও করোনা বলে মনে করা হচ্ছে। মাথা ঘোরা, কাশি, জ্বর, হাত পা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক যন্ত্রণা—এসবই তো করোনারই বৈশিষ্ট্য।

যে রোগীটা হাসপাতালে গেল, সে আর ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ। তার ফুসফুসটিকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে করোনা বাসা তৈরি করেছে কিনা কে জানে। না, তেমন হয়তো কিছু নয়। রোগী ভালো হয়ে ফিরে আসে তো জানা যাবে, ঠিক আছে। অন্যথায়, জানিয়ে দেওয়া হবে, আপনাদের রোগী ডেড। ডেডবডি দেখানো হবে না। কেননা বড্ড ছোঁয়াচে রোগ।

বিশুবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালের ভীড়ে না গিয়ে, প্রাইভেট ডাক্তার খানায় গেলেন। চার দিনে বারো লাখ টাকা খরচা হলো। কোটি লাখ টাকা হলেই বা কি! এ জীবনে থাকা যাচ্ছে না।

পৃথিবীতে যত দেশ আছে সবচেয়ে বেপরোয়া আমিষভোজী দেশ হচ্ছে চীন। সব রকমের বিষাক্ত কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে চিল, শকুন, কাক থেকে শুরু করে কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, চামচিকা পর্যন্ত কোনও কিছুই বাছবিচার নেই। তাদের প্রিয় খাদ্য সম্ভার। ২০২১-২২ খৃষ্টাব্দেও চীন দেশে নতুন মারাত্মক ভাইরাস উৎপন্ন হওয়ার যোগ আছে বলে জ্যোতিষীরা বলছেন।

কেউ বলছে বাদুড় থেকে, কেউ বলছে মুরগী থেকে এই করোনা ভাইরাস এসেছে। আগে এরকম প্লেগ রোগের জীবাণু ইঁদুর থেকে আমাদের দেশে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। তার লক্ষণ হলো প্রচণ্ড জ্বর হবে। লালাগ্রন্থি ফুলে যাবে এবং প্রচুর যন্ত্রণা হতে

থাকবে। প্লেগ মহামারী দেশে দশ বছর অবধি আতঙ্ক বজায় রেখেছিল।

আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে আগে কলেরা রোগে বহু লোক মারা গেছে। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। মাছ থেকে কলেরা রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল।

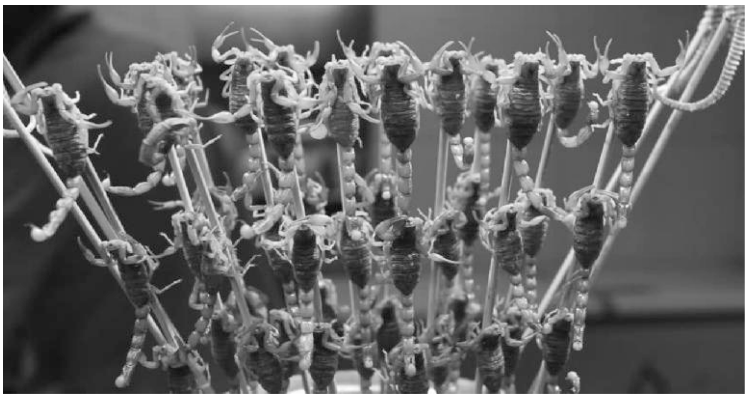

কলেরা আক্রান্ত রোগীর মল সাদা, বমি হবে, শরীরে খিচুনী প্রভৃতি উপদ্রব শুরু হবে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়বে।

কোনো কোনো মহামারী কোনো কোনো দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু করোনা সমগ্র পৃথিবীকেই আতঙ্কিত করে তুলল। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, মানুষের এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হতে লাগল। তাই সরকার থেকে লকডাউনের ব্যবস্থা করা হলো। ট্রেন, বাস, জাহাজ, প্লেন, সব বন্ধ। কোথাও জটলা পাকানো চলবে না, বেশী লোক নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান চলবে না।

করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে চলেছে, মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। কোথা থেকে লরীতে করে রোজ রাত্রে বেওয়ারিশ বহু মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে একসাথে পাঁচটা-দশটা দাহ করা হচ্ছে। কোথাও বা মাটির মধ্যে বিশাল গর্ত করে অনেকগুলো মৃতদেহ পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও মৃতদেহ পথে ঘাটে পড়ে আছে। পুলিশকে খবর দিলে তারপর কেউ এসে সরিয়ে নিচ্ছে। কেউ কেউ প্রচুর করোনা রোগীকে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। নদীমাতৃক দেশের লোকের মহাদুর্দশা ঘনিয়ে আসার সূচনা শুরু হয়ে গেল। কিছু কিছু রোগীর গুরুতর অবস্থা। অক্সিজেন চাই, অক্সিজেন চাই।

করোনা আতঙ্ক রোধ করতে কেউ খাচ্ছে হোমিওপ্যাথী, কেউ খাচ্ছে আয়ুর্বেদিক, কেউ খাচ্ছে এ্যালোপ্যাথি ট্যাবলেট। কেউ নিচ্ছে টীকা ফাস্ট ডোজ, সেকেণ্ড ডোজ বিশেষত পঁয়তাল্লিশ বছরের উর্ধ্বের ব্যক্তিরা। কিন্তু করোনার আতঙ্ক কমছে না। আবার অনেকে বিব্রত হয়ে কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করছে না। কারও কারও করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে, অসুস্থ হয়ে

কোয়ারিনটনে ছিল। এখন শারীরিক কর্মক্ষমতা কিছুটা হারাচ্ছে, তাদের শরীরের মধ্যেকার বিভিন্ন অঙ্গ কমজোরী হয়ে গেছে।

এমনও খবর আছে যে, অসুস্থ হয়েও কেউ কেউ মনে করছে ওটা এমন কিছু নয়, দু তিন দিন একটু শুয়ে থাকলেই ভালো হয়ে যাবে। অবশেষে মরিয়া হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে, কিন্তু জীবন শেষ।

কেউ বলছে, হে ভগবান, তুমি আমাদের সবাইকে রক্ষা করো। কেউ বলছে, ভগবানই আতঙ্কবাদী। এখন কি করা যাবে? সকালে কারা বানান। একটি পাত্রে হলুদ, আদা, দারচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে তাতে জল দিন। জল ফুটে উঠলেই তাতে একটু মধু, লেবুর রস, সামান্য লবণ দিয়ে গরম গরম চায়ের মতো কাপে নিয়ে চুমুক দিয়ে খান। শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে। ঠাণ্ডা, বাসী জাতীয় খাবার খাবেন না। আইসক্রীম, কোল্ড ড্রিংকস খাবেন না। রোজ ফুটন্ত জলের বাষ্প নাক দিয়ে টানুন। দিনে দু-বার সরষে তেল নাকে দিন। সরষে তেলও মাখুন। ঘর দুয়ার জিনিষপত্র পরিষ্কার রাখুন। এ.সি. রুমে থাকা ভালো নয়। যতটা সম্ভব বেশীক্ষণ রোদে কাজ করবেন।

এই অতিমারী পরিস্থিতি কবে শেষ হবে? মানুষ যদি সতর্ক সচেতন না থাকে তবে করোনা কমছে না। করোনার নির্দিষ্ট ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। করোনা আমাদের দেশে ধীরে ধীরে এখানে ওখানে ঝাপটা দিতে দিতে দুটি দফা প্রচণ্ড ঝাপটা দিয়েছে। তৃতীয় ঝাপটা এখনও বাকী আছে। আসছে।

পৃথিবী ভারাক্রান্ত হলে বিধাতার নিয়মে মহামারী অতিমারী দেখা দেয়। বহু মানুষ জন্মালে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়, তা নয়। যখন দুষ্কৃতকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। যখন মানুষ বেশী পাপাচারী, অহংকারী, দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। যখন মানুষ ধর্মবিরুদ্ধ হিংস্র পশুর মতো হয়ে যায়। দশ রকমের পাপ আছে। সেই পাপকর্মগুলি যখন মানুষ স্বাভাবিক কর্মরূপে গ্রহণ করছে — তখনই এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে পাইকারী হারে মানুষ মরে। সেটা প্রকৃতির ত্রিবিধ পদ্ধতিতেই হতে পারে। আধ্যাত্মিক— দেহ ও মন বিকল হয়ে, ব্যাধিযুক্ত হয়ে, ছন্নমতি হয়ে, উন্মাদ হয়ে মানুষ মরে যাবে। আধিদৈবিক—খরা, বন্যা, ভূ-কম্পন, বজ্রপাত, সুনামী প্রভৃতিতে মানুষ মরে যাবে। আধিভৌতিক—বিষাক্ত জীব, রোগজীবাণু, যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতিতে মানুষ মরে যাবে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধর্ম ও অধর্ম দুই দলে ১৬২ কোটি সেনা যোগ দিয়েছিল। প্রায় সবাই মারা গেল। প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের পক্ষে যারা ছিল তারাও তো মারা গেল। কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যারা আমাকে স্মরণ করতে করতে মারা গেল তারা আমার চিন্ময় ধামে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে থাকবে। আর যারা এই জগতের অন্য কিছু চিন্তা করে মারা গেল তারা এই জগতেই অন্য দেহ নিয়ে থাকবে।

অতএব করোনা আসুক আর নাই আসুক একদিন তো মরতেই হবে। কিন্তু ভক্তরা লকডাউন পরিস্থিতিতে কৃষ্ণভাবনামৃত কোর্স নিয়েই থাকে। অভক্তরা তাদের নিজ নিজ কৃষ্ণ-বহির্মুখ বিষয় নিয়েই থাকে।

এখনও সাধারণ লোকে বলে, করোনা হলেও করার কিছু নেই। টাকা যা জমে রেখেছ, বেঁচে থাকলে ভোগ করবে, না বাঁচলে এক পয়সাও যমপুরীতে নিতে পারবে না, সেখানে তোমার টাকা কোনও কাজে লাগবে না। যারা এখানে বেঁচে থাকবে তোমার পুতি নাতি, তারাই খাবে। কিন্তু কৃষ্ণনাম তোমাকে কৃষ্ণলোকে পৌঁছে দেবে।

সেনাপতি ভক্ত

প্রেমাঞ্জন দাস

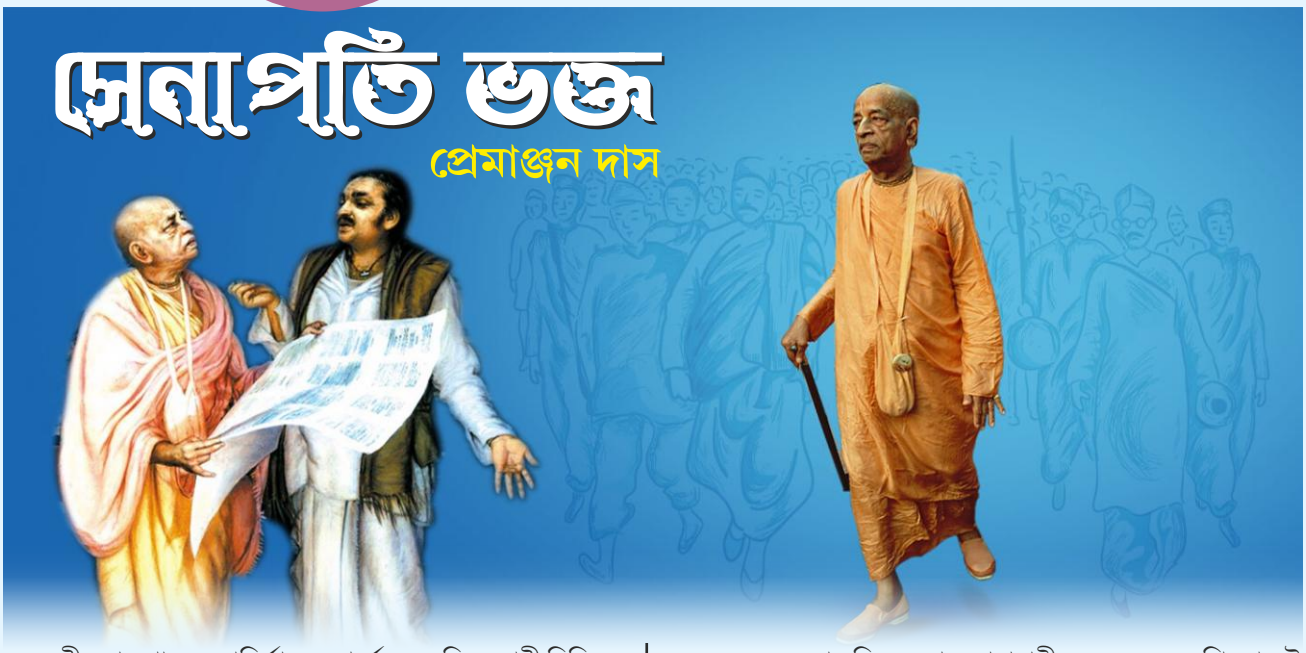

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু ভবিষ্যৎবাণী বিভিন্ন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কোথাও তাকে সেনাপতি ভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও বা বলা হয়েছে ভুরিদা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে গোপীরা বলেছেন যে যিনি ভগবানের মঙ্গলময় বাণী বিশ্বময় প্রচার করেন, তিনি হচ্ছেন ভুরিদা অর্থাৎ ভুরি ভুরি দানশীল ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ভুরিদা অর্থাৎ ভুরি ভুরি দানশীল ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন সেই ভুরিদা জনা। শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে বলা হয়েছে—যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায়। মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায়।। শ্রীল প্রভুপাদই হচ্ছেন এই সেনাপতি ভক্ত। বিভিন্ন পুরাণেও এই সেনাপতি ভক্তের উল্লেখ আছে। এছাড়া আমাদের বৈষ্ণব পুরাণেও এই সেনাপতি ভক্তের উল্লেখ আছে। এছাড়া আমাদের বৈষ্ণব পরম্পরার বহু গুরু এবং মহাজন এই সেনাপতি ভক্তের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে শ্রীল প্রভুপাদের নাম ছিল অভয়চরণ দে। ১৮৯৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর বাবার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং রজনী দেবী।

শিশুকালে অভয় স্কুলে যেতে পছন্দ করত না। এ নিয়ে তাঁর বাবার তেমন মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু মা রজনী দেবী একজন লোক রেখেছিলেন অভয়কে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বাবা গৌরমোহন ছিলেন একজন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। তিনি মাঝে মধ্যে অভয়কে পার্শ্ববর্তী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। অভয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীবিগ্রহের রূপ দর্শন করত।

১৯১৬ সালে অভয় স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। সে সময়, মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর পিতার ব্যবস্থাপনায় তিনি রাধারানী দত্ত নামে ১১ বছর বয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করেন। অবশ্য বিয়ের পর রাধারানী কয়েক বছর পিতৃগৃহেই ছিলেন। অভয় সুপ্রতিষ্ঠিত হলে রাধারানী স্বামীর গৃহে চলে আসেন। ঐ সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত স্নাতক ডিগ্রি পরিত্যাগ করেন।

স্নাতক ডিগ্রি পরিত্যাগ করায় তাঁর বাবা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন অভয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তবে গৌরমোহন তাঁর বন্ধু ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসুর ওষুধের কারখানায় অভয়কে ম্যানেজার হিসেবে কাজে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এই অল্প বয়সের ম্যানেজার দেখে কারখানার প্রাক্তন কর্মীরা বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁদের অনেকেই ঐ কারখানায় প্রায় ৪০ বছর ধরে কাজ করছিলেন। কিন্তু ডাক্তার বোস জানালেন যে অভয় নতুন হলেও আর্থিক ব্যাপারে সে অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য, অধিক পরিশ্রমী এবং পরিচালনায় সুদক্ষ। যথা সময়ে অভয় তিন পুত্র ও দুই কন্যার পিতা হন।

১৯২২ সালে, অভয় তার গুরুদেব শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি তখন উল্টোডাঙ্গার একটি বাড়ীতে হরিকথা পরিবেশন করছিলেন। অভয়ের কয়েকজন বন্ধু তাকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি সেখানে যেতে রাজি হননি। গৌরমোহন দে এসব সাধুদের নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ খাওয়াতেন। কিন্তু ওই সব সাধুদের আচার আচরণে তেমন শুদ্ধতা ছিল না বলে তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বন্ধুরা তাকে বুঝালেন যে এই সাধুটি অসাধারণ। বিশেষ করে বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মল্লিকের অনুরোধে অভয় রাজি হলেন এবং উল্টোডাঙ্গার প্রচার কেন্দ্রে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন।

সেখানে গিয়ে অভয় দেখলেন যে এক সৌম্য দর্শন মহাত্মা

বীর্যবতী হরিকথা পরিবেশন করছেন। তাঁর শরীর থেকে দিব্য কান্তি নির্গত হচ্ছে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে তিনি তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে বললেন—তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা কেন মহাপ্রভুর বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচার করছ না? অভয় যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁকে লক্ষ্য করেই প্রশ্নটি করা হচ্ছে, তখন তিনি জবাব দিলেন—ভারতবর্ষ এখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন। এই পরাধীন দেশ থেকে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা কি করে সম্ভব? শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উত্তর দিলেন—মহাপ্রভুর বাণী এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তার প্রচার কোন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। কেননা, রাজনৈতিক নেতাদের পরিবর্তন হলেও রাজনীতির কোন পরিবর্তন হবে না।

এইভাবে কিছুক্ষণ শ্রবণ করেই অভয় বুঝতে পারলেন যে উনার যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ অকাট্য, তখন তিনি অন্তর থেকে তা মেনে নিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ মল্লিক যখন প্রশ্ন করলেন, কি মনে হল, অভয় বললেন, মহাপ্রভুর বাণী এখন এক যোগ্য মহাপুরুষের হাতে রয়েছে। সেদিন থেকেই অভয় শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদকে তাঁর গুরুদেব বলে হৃদয়ে বরণ করলেন।

১৯২৫ সালে অভয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন পরিদর্শনে যান। ওষুধের ব্যবসার কাজে তিনি ইতিমধ্যেই সপরিবারে প্রয়াগরাজ এলাহাবাদ চলে গিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে কলকাতা এলেও সেখানে তিনি গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাননি। প্রথম সাক্ষাতের পর তিনি পরবর্তী চার বছরে বড় জোর ১২ বার গুরুদেবের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত গভীর হয়েছিল যে তিনি দীক্ষার জন্য অনুরোধ করলেন। ১৯৩২ সালের ২১শে নভেম্বর তিনি এলাহাবাদের গৌড়ীয় মঠে যথারীতি দীক্ষা লাভ করেন। তার নাম হল অভয়চরণারবিন্দ দাস। গুরুদেবের সঙ্গে একটু নির্ভয়ে কথা বলতেন বলে তাঁর গুরু ভাইয়েরা বলতেন, যেখানে দেবদূতেরা

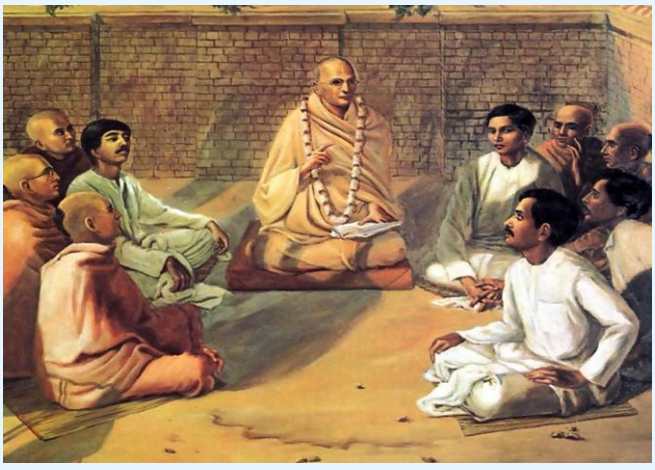

ভয় পায়, সেখানে মূর্খেরা এগিয়ে যায়। অভয় ভাবতেন, মূর্খ! হতে পারি। তবে আমি যেমন, তেমনই চলি।

১৯৩৫ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ৬২তম ব্যাসপূজা মহোৎসবে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করে শোনালেন। ঐ কবিতার একটি পয়ার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর খুব পছন্দ করেছিলেন, যার বাংলা অনুবাদটি নিম্নরূপ ঃ

পরম ব্রহ্ম পরম পুরুষ, প্রমাণ করিলে তুমি।
নির্বিশেষের নির্বাণবাদ ত্যজিল ভারতভূমি।

তাঁর গুরুদেব এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে The Harmonist পত্রিকার সম্পাদককে তিনি বলেছিলেন, এখন থেকে অভয় যা কিছু লিখবে, সবই আমাদের পত্রিকায় ছাপাবে।

ঐ বছরেই অভয় শ্রীবৃন্দাবন ধামে তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পাদককে তিনি বলেছিলেন, গুরুদেব তাকে দুঃখ করে বললেন, কিভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ শিষ্যরা বাগ বাজারের গৌড়ীয় মঠে কে কোন্ কক্ষ দখল করবে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছে। এখনই যদি এরকম হয়, তাহলে আমার দেহত্যাগের পর তারা কি করবে? তিনি আরও বলেছিলেন, এখন আমার মনে হচ্ছে যে মঠের মার্বেলগুলি বিক্রি করে গ্রন্থ ছাপাই। মনে হচ্ছে আমার দেহত্যাগের পর মঠে আগুন লাগবে। অভয়, যদি তোমার টাকা থাকে তাহলে গ্রন্থ ছাপিও।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন। তার এক মাস আগে অভয় চরণারবিন্দ তাঁর গুরুদেবকে চিঠি লিখে ছিলেন এই বলে যে আমি একজন গৃহস্থ, আপনার অন্যান্য ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যদের মতো সেবা করতে পারছি না। দয়া করে বলুন, কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

দুই সপ্তাহ পরে এই চিঠির উত্তর এসেছিল গুরুদেবের কাছ থেকে। তিনি লিখলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যারা হিন্দি বা বাংলা জানে না, তুমি ইংরেজি ভাষায় আমাদের ভাবনা ও যুক্তিকে তাদের

কাছে উপস্থাপন করতে পারবে। এটি তোমার শ্রোতাদের পক্ষে এবং তোমার পক্ষেও যথেষ্ট মঙ্গলজনক হবে। আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী যে তুমি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নিজেকে একজন সুদক্ষ প্রচারক রূপে পরিণত করতে পারবে।

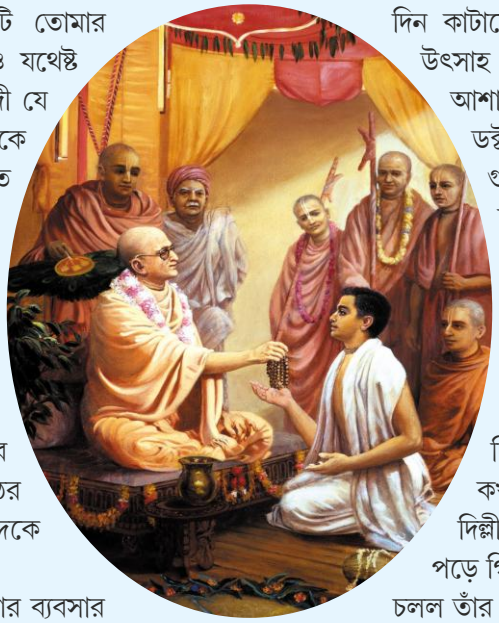

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের দেহত্যাগের পরে পরেই তাঁর ভবিষ্যতবাণী অনুসারে মঠে কলহের আগুন লেগে গেল। শুরু হয়ে গেল দীর্ঘমেয়াদী মামলা মোকদ্দমা। গুরুদেবের প্রচারের স্বপ্ন যেন নিভে গেল। গুরুদেবের দেহত্যাগের কিছুদিন পরেই গৌড়ীয় মঠের জ্যেষ্ঠ গুরুভাইয়েরা অভয়চরণারবিন্দকে ভক্তিবেদান্ত উপাধিতে ভূষিত করলেন।

অভয়চরণারবিন্দ প্রভু নানাভাবে তাঁর ব্যবসার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যবসা ক্রমশ অবনতির পথেই চলল। সবকিছু কৃষ্ণের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর পারমার্থিক জীবনে অধিক মনোনিবেশ করলেন। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তিনি ইংরেজিতে ব্যাক টু গড হেড পত্রিকা ছাপাতে শুরু করলেন। লেখা থেকে শুরু করে প্রুফ সংশোধন, বিতরণ—সব কাজ তিনি একাই করতেন। একবার শুরু করার পর কোনও পরিস্থিতেই তিনি সেটা বন্ধ করেননি। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগ হল। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হল। কৃষ্ণভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাঁর পত্রিকায় এসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। ১৯৪৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি গান্ধীজীকে একটি পত্র লিখলেন যাতে তিনি বলেছিলেন যে রাজনীতি পরিত্যাগ করে পারমার্থিক জীবন গ্রহণ না করলে তাকে হিটলার প্রমুখ নেতাদের মতো মৃত্যু বরণ করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই গান্ধীজীকে আততায়ীদের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হল। তাঁর প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

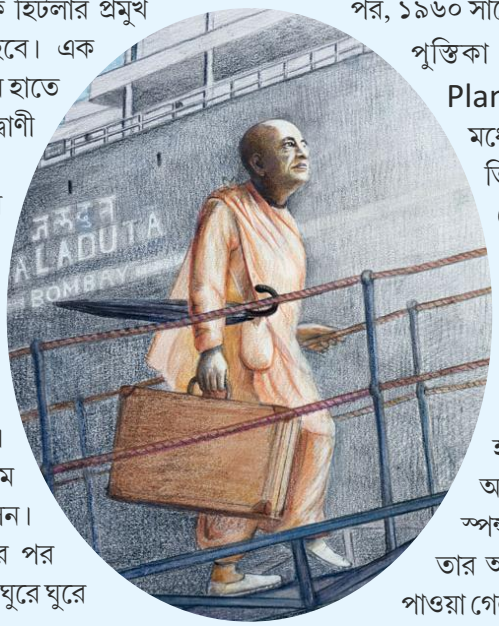

১৯৫০ সালে তাঁর ছেলের হাতে ব্যবসার দায়িত্ব তুলে দিয়ে অভয়চরণারবিন্দ বাণপ্রস্থ গ্রহণ করলেন। ঝাঁসিতে স্থাপন করলেন লীগ অব ডিভোটিজ। কিন্তু সেখানকার গভর্নর পত্নী মহিলা ক্লাব করার অজুহাতে সেই বিল্ডিংটি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। ঝাঁসিতেই তিনি ১৯৫৩ সালে তাঁর প্রথম শিষ্য আচার্য দাসকে দীক্ষা দান করেছিলেন। ঝাঁসির প্রচার কেন্দ্রটি হাত ছাড়া হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন মঠে ও অনুরাগীদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু প্রচার কার্যে তাঁর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। সাহায্য লাভের আশায় তিনি ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে চললেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেননি সাহায্য করতে।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভক্তিবেদান্ত প্রভু বৃন্দাবনের বংশী গোপালজী মন্দিরে স্থানান্তরিত হলেন। সেখান থেকে প্রতিদিন ভোরে ট্রেনে করে দিল্লি যেতেন। সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। কখনো ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে দিল্লীর পথে পথে ঘুরতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে গিয়েছেন রাস্তার পাশে। কিন্তু এর মধ্যেই চলল তাঁর লেখালেখি, বিতরণ এবং যোগাযোগের সংগ্রাম।

তার কিছুদিন পর ভক্তিবেদান্ত প্রভু বৃন্দাবনের শহর এলাকায় অবস্থিত, রূপ গোস্বামী প্রমুখ মহাজনদের সমাধির পাশে তাঁদেরই স্মৃতি বিজড়িত শ্রীশ্রীরাধা দামোদর মন্দিরে চলে যান। সেখানেই তিনি শুরু করেন তাঁর জীবনের এক মহান কার্য—১৮ হাজার শ্লোক সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজি অনুবাদ।

একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর গুরুদেব তাঁকে সমুদ্র বক্ষে পথ দেখিয়ে পাশ্চাত্য দেশের অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই স্বপ্ন তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। ১৯৫৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি মথুরায় তাঁর গুরুভাই শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর, ১৯৬০ সালের তিনি দিল্লী থেকে তার প্রথম ইংরেজি পুস্তিকা Easy Journey to Other Planets প্রকাশ করেন। পরবর্তী দুবছরের মধ্যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য সংগ্রহ করে তিনি ওই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

বিগত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার পর এবার শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। মথুরার একজন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আগরওয়ালের পুত্র আমেরিকা থেকে তার স্পন্সরের ব্যবস্থা করলেন এবং কৃষ্ণের কৃপায় তার আমেরিকা যাওয়ার পাসপোর্ট এবং ভিসা পাওয়া গেল।

সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানির মালিক শ্রীমতি মোরারজিকে অনুনয় বিনয় করে তিনি তার জলদূত নামক জাহাজের একটি টিকিট সংগ্রহ করলেন। মায়াপুরে গুরুদেবের সমাধির সামনে কৃপা ভিক্ষা করে, ১৯৬৫ সালের ১৩ই আগস্ট কলকাতা থেকে তিনি সেই জাহাজে করে যাত্রা করলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। জাহাজে তার দুবার হার্ট অ্যাটাক হল। কৃষ্ণ তাঁর স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অভয় প্রদান করলেন। ১৯৬৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাহাজ গিয়ে পৌঁছাল আমেরিকার বোস্টন শহরে।

কিছুদিন গোপাল আগরওয়ালের বাড়িতে থাকার পর শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী ডক্টর রামমূর্তি মিশ্র নামের এক মায়াবাদী যোগ শিক্ষকের কক্ষে স্থানান্তরিত হন। দার্শনিক বৈষম্যের কারণে ডক্টর মিশ্রের সঙ্গে তাঁর কিছু সমস্যা হচ্ছিল। সেখান থেকে তিনি আর একটি বাথরুম বিহীন কক্ষে উঠেছিলেন এবং ডক্টর মিশ্রের ঘরে গিয়ে স্নানাদি করতেন। অবশেষে চলে গেলেন মদ্যপ পরিবেষ্টিত বাউরি এলাকায়। সেখানে কেউ তাঁর টেপ রেকর্ডার ও টাইপ রাইটার চুরি করেছিল।

এর মধ্যেই তাঁর কিছু অনুগামী তৈরি হয়েছিল। তাদের সহযোগিতায় ২৬ সেকেন্ড এভিনিউতে ম্যাচলেস গিফট নামক একটি দোকানে স্থানান্তরিত হন। সব পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁর গ্রন্থ বিক্রয়, প্রবচন, ভোগ নিবেদন সব কিছুই চলছিল। এই দোকান ঘরেই নথিভুক্ত হয় তাঁর প্রথম ইসকন কেন্দ্র। সেখানেই তিনি তাঁর প্রথম ১১ জন অনুগামীকে বৈষ্ণব দীক্ষা দান করেন। নব দীক্ষিত মুকুন্দ এবং জানকীর বিবাহ অনুষ্ঠান এখানেই সম্পাদন করেছিলেন তিনি। এইসব নব দীক্ষিত শিষ্যদের নিয়ে রবিবার চলে গেলেন টমকিনস্ স্কয়ার পার্কে। সেখানে হরে কৃষ্ণ কীর্তনে মাতিয়ে তুললেন সমাগত হিপ্পি যুবক যুবতীদের।

১৯৭১ সালের মে মাসে ম্যাক মিলান কোম্পানি থেকে প্রকাশ করলেন তাঁর ইংরেজি ভগবদ্গীতা যথাযথ। নিউইয়র্ক থেকে মুকুন্দ আর জানকীকে পাঠিয়ে দিলেন সানফ্রান্সিসকোতে ইসকনের নতুন কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল ইসকনের দ্বিতীয় মন্দির। তাঁরা সেখানে নিয়ে গেলেন শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামীকে। সেখানে জানকী মাতাজী এক ভারতীয় দোকান থেকে সংগ্রহ করলেন শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রার ছোট বিগ্রহ। তা দেখে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে শ্যামসুন্দর প্রভু তৈরি করলেন বড় জগন্নাথ বিগ্রহ। শ্রীল প্রভুপাদের অনুপ্রেরণায় সানফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত হল ইসকনের প্রথম রথযাত্রা। আর একটি মন্দির স্থাপিত হল মন্ট্রিলে।

১৯৬৮ সাল থেকে শিষ্যরা তাঁকে শ্রীল প্রভুপাদ নামে সম্বোধন করতে শুরু করেন। দেখতে দেখতে দাবানলের মত প্রসারিত হল ইসকন। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসী শিষ্য কীর্তনানন্দ স্বামীর মাধ্যমে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ২০০০ একর জমিতে গড়ে উঠলো নিউ বৃন্দাবন প্রকল্প। তাঁর বিভিন্ন শিষ্যদের শক্তি সঞ্চার করে তিনি তাদেরকে দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন। ছয় জন শিষ্য লন্ডনে গিয়ে বিটল গায়ক জর্জ হ্যারিসনের অনুদানে প্রকাশ করলেন কৃষ্ণ গ্রন্থটি। ইসকনের সুপরিচালনার স্বার্থে গঠন করলেন গভার্নিং বডি কমিশন। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্থাপন করলেন ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট। বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করার জন্য গঠন করলেন ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট। ১৯৭১ সালের মে মাসে মায়াপুরে ক্রয় করলেন ৫ একর জমি। সেখানে শুরু করলেন ওয়ার্ল্ড হেড কোয়ার্টার। স্থাপন করলেন বিশ্ব মন্দিরের (TOVP)-এর ভিত্তি। এর মধ্যে শ্যামসুন্দর প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়াতে গিয়েছিলেন একবার প্রচার করতে। বিভিন্ন মন্দিরে শুরু করলেন গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা। মুম্বাই ও বৃন্দাবনে নির্মাণ করলেন রাজকীয় মন্দির। শুরু করলেন বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও ৮০ খণ্ড গ্রন্থ ছাপালেন। ১০৮টি মন্দির করলেন। ১০০০০ শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এক শতাংশ কথাও বলা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনেই নির্মিত হয় অপূর্ব সুন্দর সমাধি। মায়াপুরে নির্মিত হল পুষ্প সমাধি। ইতি মধ্যে ইসকন এক বিশ্বব্যাপী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে বেড়েছে অগণিত অনুগামী আর মন্দির। জয় শ্রীল প্রভুপাদ।

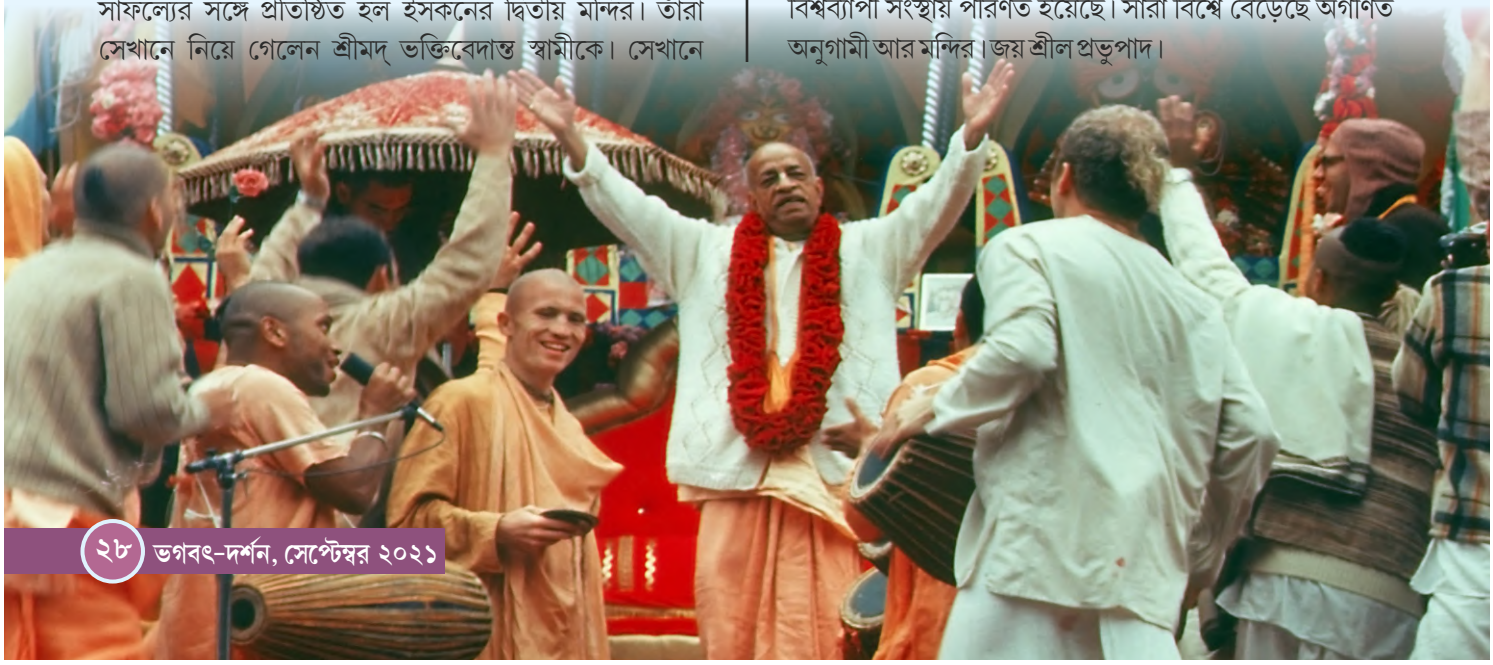

নারদমুনি এবং সাপ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত।

উপদেশ ঃ নাস্তিকরা উপদ্রব করলে সবসময় ভক্তদের প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করা যেতে পারে। যদি তারা আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যেক ভক্তের কৃষ্ণের মন্দির এবং তাঁর ভক্তদের যথাযথ ভাবে রক্ষা করা উচিত।

শ্রীরাধিকা বন্দনা

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।১।।

সুরসিকা মৃগাক্ষিকা রমণী-শিরোমণিকা।
আনন্দিত নন্দসূতের প্রেমদীঘি-মরালিকা।।
ব্রজগোপ বৃষভানুর পবিত্র কল্পলতিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।১।।

স্ফুরদরুণ-দুকুল-দ্যোতিত্যোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।২।।

সুসজ্জিতা সুশোভিতা লোহিত পট্ট শাটিকা।
নৃত্যছলে কটি'পরি দোলাও বরকাঞ্চিকা।।
বক্ষোদেশে মুক্তামালা নাহি তার উপমিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।২।।

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।৩।।

সনাতনী তরুণতা সর্বদিগ্-উজ্জ্বলিকা।
চিরকিশোরী নিরুপমা সর্বাঙ্গসুকান্তিকা।।
বিম্বাধরে মৃদু মৃদু হাস্যরস বিস্তারিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৩।।

অতি চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।৪।।

চঞ্চলিত নন্দপুত্রে হেরি শঙ্কিল-অক্ষিকা।
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করো মধুর মৃদু-কথিকা।।
আরাধনা করো তুমি ওগো পরমারাধিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৪।।

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত-ললিতান্তঃ-স্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্মপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।৫।।

নন্দরাণীর নয়নমণি কৃষ্ণবৎ স্নেহপাত্রিকা।
ললিতার স্নেহে তুমি প্রফুল্ল অন্তরাত্মিকা।।
ব্রজনারীর প্রাণরূপা সর্বপীরিতি-মণিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৫।।

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্মপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।৬।।

বৃন্দাবনে বনমাঝে সাথে সখী বিশাখিকা।
পুষ্প তুলি রচনা করো বৈজয়ন্তী মালিকা।।
প্রিয়বরা সুমঙ্গলা গোবিন্দ-অন্তরঙ্গিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৬।।

প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহর-কণ্ডুং তন্বতী নম্র-বক্ত্রা।
স্মপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।৭।।

স্নিগ্ধ বংশী ধ্বনি শুনি হও দ্রুত অভিসারিকা।
কৃষ্ণকুঞ্জে প্রবেশ করো মিলিত চক্ষুপদ্মিকা।।
কর্ণপদ্ম কণ্ডুয়নী বিনত শ্রীবদনিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৭।।

অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ান্ত বকারিং
স্মপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।৮।।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলা দেখো নিজ সরসিকা।
স্নিগ্ধবায়ু পদ্মরাজি ছড়ায় সু-সুরভিকা।।
কৃষ্ণসঙ্গে জলকেলি সঙ্গে লই সহচরিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৮।।

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃতনিখিলাশা-সতন্তিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপতি-কুমারঃ কামমামোদিস্তং
নিজ-জনগণ-মধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি।।৯।।

পরিশুদ্ধ দৈন্যচিত্তে যে পড়ে রাধা-অষ্টকা।
পাবে ব্রজরাজসূত কৃপাসুদৃষ্টিকণিকা।।
সে সুজন ভাগ্যবন্ত হয় রাধাপদ-সাধিকা।
নিজদাস্য প্রদান করো হে কৃষ্ণময়ী রাধিকা।।৯।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী